সংবাদ প্রতিদিন
৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

রোববার

সংবাদ প্রতিদিন -এর সঙ্গে বিনামূল্যে



রবি ঘোষ



পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ মানবেন্দ্র দেওয়ানজি

স্ক্যান ঃ দেব কুমার দেব

এডিট ঃ স্নেহময় বিশ্বাস

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com



অঞ্জলি জুয়েলার্স®
সবার জন্য
ডায়মন্ড কালেকশন
নতুন শোরুম
বহরমপুর ~ ৩১৪/এ/জি/১ নেতাজী রোড, পোঃ খাগড়া, মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১০৩
ফোন : (০৩৪৮২) ২৫৮ ৪৯৮
উপহার কেনা আর সময়সাপেক্ষ নয়।
Gifty
GIFT VOUCHER
যেকোনো মূল্যের পাওয়া যায়।
সবরকম গয়নার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
যোগাযোগ করুন স্টোর ম্যানেজারের সঙ্গে।
জুয়েলপ্লাস স্কীমে মাসে মাসে ১০০, ২৫০, ৫০০, ১০০০ টাকা বা তার বেশীর কিস্তিতে ধাপে ধাপে টাকা জমান।
১২ মাসের কিস্তি দিন
১ মাসের কিস্তি পান ডিসকাউন্ট!
এবার আপনি জুয়েলপ্লাস স্কীম করতে পারেন ১৮ বা ২৪ মাসের জন্যেও!!
ECS-এর সুবিধাও আছে।
গোলপার্ক - ২৪৬০ ০৫৮১/২৪৪০ ১৭৯২
শোভাবাজার - ২৫৩৩ ৫৮৩২/৩৪
সল্টলেক বি.ই. - ২৩২১ ২৭৮৬
সল্টলেক এইচ.এ. - ২৩২১ ৮৩১০/১১
বেহালা - ২৪৪৫ ৫৭৮৪/৮৫
হাওড়া পঞ্চাননতলা - ২৬৪২ ৪৬৪০/৪১
বারাসাত ডাকবাংলো মোড় - ২৫৮৪ ৭১৩৯/৪২
শিলিগুড়ি আশ্রম পাড়া - ০৩৫৩-২৬৪৩৩৩৫
(রামকৃষ্ণ সারদামণি বিদ্যাপীঠের বিপরীতে)
বৌবাজার - ২২৬৪ ১১৯৫
এছাড়া আমাদের আর কোনো শাখা নেই।
www.anjali.bz
Mayurakshi/521/13

প্রতিদিন
৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

রোববার

রোববার-এর নতুন ওয়েব-ঠিকানা
রোববার
www.ezinemart.com

প্রচ্ছদ : 'রবি ঘোষ' স্মারক সংকলন থেকে

কৃতজ্ঞতা : রবি ঘোষ স্মৃতি সংসদ
সৌজন্য : ডা. বারীন রায়

অনিবার্য কারণে এই সংখ্যায় 'গোসাঁইবাগান', 'কথা অমৃত সমান', 'আটটা ন'টার সূর্য' এবং 'ডাকসাইটে' প্রকাশিত হল না।

টিম রোববার

তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলাঞ্জনা বসু, প্রসূন চক্রবর্তী,
বর্ণিনী মৈত্র চক্রবর্তী, ভাস্কর লেট, রিংকা চক্রবর্তী
রাজু সরদার, শান্তনু দে, সুপ্রিয় দাস
সম্পাদক ঋতুপর্ণ ঘোষ
সহযোগী সম্পাদক অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়

প্রতিদিন প্রকাশনী লিমিটেডের পক্ষে সৃঞ্জয় বোস কর্তৃক বি এল পাব্লিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত।

সংবাদ প্রতিদিন-এর সঙ্গে বিনামূল্যে

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে যেমন দ্বিজেন্দ্র, সত্যেন্দ্র, রবীন্দ্র—সিমলে-র দত্তবাড়িতেও তেমনই নরেন্দ্র, মহেন্দ্র, ভূপেন্দ্র। এই প্রতিযোগিতার কারণেই কি নরেন্দ্রনাথ চট করে 'নরেন' হয়ে উঠলেন?





রবীন্দ্র-সার্ধশতবর্ষ শেষ হতে-না-হতেই স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধশতবর্ষ।

এক বছরের ছোট-বড় এই দুই বাঙালি মনীষীর তেমন সদ্ভাব ছিল না বলেই শোনা যায়।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি থেকে স্বামীজি'র জন্মস্থান সিমলে-র দত্তবাড়ি প্রায় ঢিলছোঁড়া দূরত্ব। অতএব বাল্যকাল থেকেই তাঁরা প্রতিবেশী। ঠাকুরবাড়িতে যেমন দ্বিজেন্দ্র, সত্যেন্দ্র, রবীন্দ্র—দত্তবাড়িতেও তেমন নরেন্দ্র, মহেন্দ্র, ভূপেন্দ্র।

জানি না, এই প্রতিযোগিতার কারণেই নরেন্দ্রনাথ দত্ত চট করে 'নরেন' হয়ে উঠলেন কি না!

নরেন্দ্রনাথ দত্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন বলে শোনা যায়। রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের মুখোমুখি সাক্ষাৎ একবারই মাত্র ঘটেছিল, ভগিনী নিবেদিতার কল্যাণে—এমনটাও পড়েছি কোথাও। অতএব রবীন্দ্রনাথ আর নরেন্দ্রনাথ সমসাময়িক হয়েও মিত্র নন, শত্রু নন—কেবল প্রতিদ্বন্দ্বী।

এই বছর ১২ জানুয়ারি সন্ধেবেলা গড়িয়াহাট ফ্লাইওভার বেয়ে গোলপার্কের দিকে এগোচ্ছি, দেখলাম—গোলপার্কের রেলিং ঘিরে টুনি বাল্‌বের আলোকসজ্জায় বিবেকানন্দর জীবনালেখ্য।

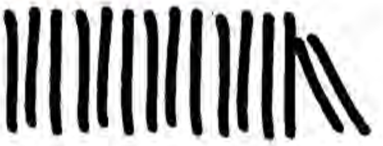
ভিতরে বোধহয় স্বামীজি'র জন্মদিবস উপলক্ষে কোনও অনুষ্ঠান চলছিল। গম্ভীর গলায় একটি বক্তৃতা শেষ হল এবং ঘোষণা হল সংগীত পরিবেশনের।

চলন্ত গাড়িতে আমার মনও উৎকর্ণ হল কী গান হবে ভেবে? হঠাৎ ট্রাফিক সিগন্যাল থেকে ভেসে এল, 'ওগো. দখিন হাওয়ার...'।

জীবদ্দশায় দুই প্রাতঃস্মরণীয় বাঙালি না-হয় বন্ধু হতে পারলেন না, সার্ধশতবর্ষের কলকাতাও যে সেই বৈরিতার এক জলজ্যান্ত প্রতিমা—যেটা দেখে একটু মনখারাপ হল, আবার মজাও লাগল।

ইতিহাসের কী অকল্পনীয় স্মরণশক্তি!


nnoni®
contemporary jewellery
যখন তখন
Pearl
COLLECTION
নতুন শোরুম
বহরমপুর - ৩১৬/এ/১/২ নেতাজী রোড, পোঃ খাগড়া, মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১০৩
ফোন ঃ ০৩৪৮২-২৫৮৪১৪, ৯২৩০৭ ০৯১২৯
দুর্গাপুর - নাচন রোড, অনুরাধা সিনেমা হলের বিপরীতে, বেনাচিটি, দুর্গাপুর, ফোন ঃ (০৩৪৩) ২৫৮৮০২৪
বেলেঘাটা - ২৩৬৩ ৯৮৫২ | বেহালা - ২৪৮৮ ৯৯৮২ | গড়িয়া মহামায়াতলা - ২৪৩৫ ২৯১৮ | বাটানগর - ২৪৯২ ৪১১১
বাঘাযতীন - ২৪২৯ ৭৭০৯ | মধ্যমগ্রাম - ২৫২৬ ৭৬২২ | চন্দননগর - ২৬৮৩ ০১৪২ | হাওড়া - ২৬৬৭ ১০৫৫
নাগেরবাজার - ২৫৬০ ০৪৪৬ | বিডন স্ট্রীট - ২৫৩০ ৭৯০৮ | হাতীবাগান - ২৫৫৫ ১৯১৯ | ভবানীপুর - ২৪৫৪ ৩৭৬০
গোলপার্ক - ২৪৬০ ৫৩৬৪ | হলদিয়া - (০৩২২৪) ২৭২১২০ | শ্রীরামপুর - ২৬৫২ ৯৫৯৩ | গড়িয়াহাট - ২৪৬০ ৫৪৮৪
সল্টলেক - ২৩৫৯ ২১১৬ | এছাড়া আমাদের আর কোনো শাখা নেই। দোকান খোলা প্রতিদিন সকাল ১০.৩০ থেকে রাত ৮.৩০ পর্যন্ত।
Mayurakshi/522/13
An Anjali Jewellers Initiative | customercare@nnoni.in | www.nnoni.in
Silver | Pearl | Costume



স্তেফান মালার্মে বিশ শতকের প্রায় সমস্ত পশ্চিমী সাহিত্যতত্ত্বের আদিপুরুষ। তাঁর ভাবনাচিন্তাকে না-জেনে যাঁরা সোস্যুর-বার্ত-দেরিদা'র নাম করেন, করুণাঘন অবজ্ঞায় তাঁদের ছিন্ন পাঠমালা আমরা আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করতে পারি।

ঘুমের মধ্যে আটতিরিশ বছর আগেকার বিলুপ্ত এক রাত ফিরে এল ডুবসাঁতার দিয়ে। কোন অঘ্রানের শিশিরে হারিয়ে গিয়েছিল সেই বইয়ের রাত!

আমি দেখছি জীবনানন্দের 'বিলাস' গল্পের মাস্টারমশাই গলা খাঁকরে শান্তিশেখরকে বলছেন :

> 'বইগুলো দেখেছ?'
>
> 'দেখছি।'
>
> কতকগুলো আলমারির লবেজান অন্ধকার—অন্ধকারের তিক্ততি পবিত্রতা তবু—ধূপের আবছায়া আর মণিপামহম্—টেবিল ডেস্ক ও একটা বৈরাট্যের ছায়ান্ধকার ছাড়া কিছুই দেখছিল না সে তবুও। এ-জিনিসগুলোও দেখছিল না। ঠিক, অনুভব করছিল।
>
> 'এই বইগুলো তুমি কিনেছ হয়তো—' মাস্টারমশাই বললেন।
>
> 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি—, আপনিও কিনতে বলেছিলেন—'
>
> 'আমি? কিন্তু এসব বই কী হবে? এ তো ইস্কুলের ছেলেদের লাইব্রেরি। তুমি কি আশা কর, ওরা মালার্মের বই পড়বে?'
>
> 'মালার্মে?' শান্তিশেখর একটু থতমত খেয়ে বললে।
>
> 'এই তো—এই যে—'
>
> ...শান্তিশেখরের মনে হ'ল, মাস্টারমশাই মালার্মের দু-তিনখানা বই আলগোছে টুঁ-শব্দ না-ক'রে কোথায় যেন রেখে দিলেন। মনে হল, আমলকিপল্লবের থেকে শিশির ঝ'রে পড়ল যেন হেমন্ত রাতের পাখির পালকে, ছায়া-আঙুলের নিঃশব্দতায় বইগুলো অন্তর্হিত হয়ে গেল কোথায়; সে-সব বইয়ের মলাট কীরকম, তাও দেখবার সুযোগ হ'ল না শান্তিশেখরের...

হঠাৎ মনে হল ময়লা গেঞ্জি গায়ে ভাঙা পেয়ালা হাতে ওই গল্পের মাস্টারমশাই অপরেশবাবু নয়, আমাদের ইস্কুলের বাংলার মাস্টারমশাই জ্যোতিবাবু। জ্যোতিভূষণ চাকী মধ্যবিত্ত বারান্দার সেই ভাঙাচোরা টেবিলের এক আধো-অন্ধকার কোণে বসে সংস্কৃত থেকে নন্দনতত্ত্বের সূত্রগুলোকে এক অপূর্ব অভিনিবেশে অনুবাদ করতে-করতে বললেন, 'তুই কিন্তু বললি না মালার্মের কথা। ভুলে গেলি।'

আমি মাটির ওপরে খড়ি দিয়ে লিখি, মালার্মে।

মালার্মে।

হারিয়ে যাওয়া এক পিতা।

পল ক্লোদেলের ভাষায়, 'la fleur suprême de Paris'। প্যারিসের পারিজাত।

তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'-র ভূমিকায় প্রথম ছত্রেই যাঁর নাম উৎকীর্ণ করেছিলেন জীবনানন্দ। জীবনানন্দের মতো 'আধুনিকতম', দুঃসাহসিক অভিযাত্রী ছাড়া আর কে বুঝতে পারতেন মালার্মের রহস্যমেদুর অভিযানমালা? যিনি লিখতে পেরেছেন 'নগ্ন নির্জন হাত' অথবা 'অন্ধকার'

> গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত;
> আমাকে কেন জাগাতে চাও?
> হে সময়গ্রন্থি, হে সূর্য, হে মাঘনিশীথের কোকিল, হে স্মৃতি,
>   হে হিম হাওয়া।
> আমাকে জাগাতে চাও কেন।

তিনি ছাড়া আর কে দীপিত করবে কবিতার কিন্নরকণ্ঠ দেবদারু গাছ?

শব্দের মানে না-বুঝে আমি কবিতা পড়েছি অনেকদিন। অনেক অনেকদিন শুধু শব্দের ভাস্কর্য, তার দৈর্ঘ্য, তার র-ফলা ও রেফ আমাকে ডেকে নিয়েছে কবিতাত্মার দিকে। কবিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপাসক মালার্মে যেভাবে ভেবেছিলেন সেইভাবে। একমাত্র এভাবেই কি ছোঁয়া যায় না আবহমান কবিতাশরীরকে?

স্তেফান মালার্মে (১৮৪২-১৮৯৮, আসল নাম এতিয়েন মালার্মে)-র জন্ম বোদল্যের-এর কবিতা থেকে। তিনি বোদল্যের-এর অভিযানের এক সেনাপতি, তাঁর নতুন প্রস্বরকে তিনি অনুসরণ করেছেন। তবু তিনি কবিতার ইতিহাসে সম্পূর্ণ এককভাবে স্বতন্ত্র। তিনি বিশ শতকের প্রায় সমস্ত পশ্চিমী সাহিত্যতত্ত্বের আদিপুরুষ। তাঁর ভাবনাচিন্তাকে না-জেনে যাঁরা সোস্যুর-বার্ত-দেরিদা'র নাম করেন, করুণাঘন অবজ্ঞায় তাঁদের ছিন্ন পাঠমালা আমরা আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করতে পারি।

অশ্লীল বাস্তব, তার কদর্যতা আর একঘেয়েমিকে ঘৃণা করতেন মালার্মে ('La chair est triste, hélas!' হায়, কী · বিষণ্ণ মাংস!), তাই তিনি নৈরাশ্য আর বিতৃষ্ণাকে কাটিয়ে উঠতে সমুদ্রযাত্রা ('সমুদ্রবাতাস') এবং মৃত্যুর ('ঘণ্টাবাদক') কথা ভেবেছেন। বোদল্যের-এর মতো তিনিও স্বপ্ন দেখেছিলেন এক রহস্যমেদুর স্বর্গের ('তিক্ত বিশ্রামে ক্লান্ত', 'জানলাগুলি' 'আকাশনীল')।

কিন্তু মালার্মে তাঁর যন্ত্রণা আর উৎকণ্ঠাকে দিলেন এক নিজস্ব নৈর্ব্যক্তিক শরীর। এই পৃথিবী তাঁর সূক্ষ্মতাকে ধারণ করতে অক্ষম, এক কাল্পনিক বিশ্ব নির্মাণ করতে অনুপ্রাণিত করে না; এক সাদা পৃষ্ঠায় মালার্মে তাঁর অক্ষমতার কথা স্বীকার করতে চান। জীবন সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ আর স্বপ্নে আশাহত, অপবিত্রতার খাদ (যা তাঁকে দেয় বিবমিষা) এবং পবিত্রতার সমুদ্রের (যার সামনে তাঁর মাথা ঘোরে) মাঝে স্থাণুর মতো তিনি দাঁড়িয়ে। 'জানলা' কবিতায় মালার্মে এক মৃত্যুযাত্রীর বর্ণনা করেন যে 'বিষণ্ণ হাসপাতালে ক্লান্ত' মুখ রাখে রৌদ্রস্নাত কাচের দেয়ালে, আর হয়ে ওঠে দিনগত পাপক্ষয়-ক্লান্ত ব্যর্থ পলাতকের প্রতীক। 'আকাশনীল' কবিতায় এক ভয়ঙ্কর হতাশাদীর্ণ কবির ছবি আঁকেন যিনি এক অসম্ভব আদর্শের সামনে আর্তনাদ করে ওঠেন।

এই কানাগলি থেকে বেরতে চান তিনি, বন্ধ্যাত্বের পরিসমাপ্তি চান এক নতুন নান্দনিকতার সন্ধানে, কিন্তু বাধা হয়ে ওঠে পেশাগত সংকট ও স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা—নিদ্রাহীনতা, নিউর‍্যালজিয়া, আত্মহত্যার চেষ্টা। অবশেষে ১৮৭১ সালে ২৯ বছর বয়সে প্যারিসে ইংরেজির শিক্ষকের চাকরি হল মালার্মের। ল্যকঁৎ দ্য লিলের ভাষায়, 'স্তেফান মালার্মে এলেন, আগের চেয়েও নম্র, বিনীত ও উন্মাদ এবং কপর্দকহীন। সঙ্গে এমন কিছু গদ্য এবং কবিতা যা একেবারে অবোধ্য, স্ত্রী ও দুই শিশু যার একজন তখনও জন্মায়নি।'

১৮৭৫ সালে নতুন করে পরিমার্জনা করলেন তাঁর ইশারাময় কবিতা 'ফনের বিকেল'। য়্যুইসমাঁস তাঁর প্রশংসা করায় হুহু করে খ্যাতি বাড়ে। ফরাসি কবিতার নতুন তীর্থক্ষেত্র ৮৭, র‍্যু দ্য রোম-এর বাড়িতে মঙ্গলবারের বিখ্যাত সাহিত্যবাসরে আসেন ভক্ত আর শিষ্যেরা, আসেন আঁদ্রে জিদ ও পল ভালেরি নামে দুই তরুণ। আসেন দ্যবুসি, জ্যুল লাফর্গ, মরিস মেতেরল্যাঁক, গুস্তাভ্ কান, আলফ্রেদ জারি, চিত্রশিল্পী মানে, মনে, দ্যগা, পিসারো, হুইসলার, গগ্যাঁ, অগ্যুস্ত র‍্যনোয়ার। গভীর নিষ্ঠায় আর অনন্ত ধৈর্যে মালার্মে তিল-তিল করে নির্মাণ করছিলেন নিবিড় ও সমাহিত 'দুর্বোধ্যতম' সব কবিতা (বোদল্যের, ভেরলেন, পো আর ভাগনারের সমাধি নিয়ে কবিতা কিংবা 'বলাকা' সনেট)।



মানে-র আঁকা স্তেফান মালার্মে-র পোর্ট্রেট, ১৮৭৬

সেই সঙ্গে নির্মাণ করতে থাকেন যুগান্তকারী এক নন্দনতত্ত্ব। ১৮৯৭ সালে, মৃত্যুর আগের বছর 'অসংলগ্ন ভাবনা' নামে এক সংকলনের জন্য একত্র করেন তাঁর সব ভাবনাচূর্ণ এবং বক্তৃতা। একই বছর প্রকাশিত হয় সম্ভবত তাঁর সবচেয়ে বিতর্কিত কবিতা 'পাশার এক দান'। অদ্ভুত টাইপোগ্রাফিতে ছাপা এই কবিতায় তিনি এক অসম্বন্ধ পৃথিবীর রহস্যভেদ করার জন্য চিন্তার অভিযানের প্রকল্পের কথা বলেছেন। এই অভিযান তো কবিরও অভিযান। তিনি পৃষ্ঠার ওপর শব্দ প্রক্ষেপণ করেন, এক পরম বাস্তব (la réalité absolue)-কে প্রকাশ করার জন্য শব্দের আদর্শ সংস্থাপনকে খুঁজে বেড়ান। শূন্যতার ঘোড়সওয়ার মালার্মে তাঁর চূড়ান্ত প্রচেষ্টাগুলোর অসফলতার মধ্যে দিয়ে আবার খুঁজে পেলেন সাদা পৃষ্ঠার হতাশা।

মালার্মে হয়ে উঠলেন বাতাস-রুদ্ধ এক তাত্ত্বিক, হয়ে উঠলেন গভীরভাবে আত্মস্থ আর সমাহিত কবিতার প্রবক্তা ও পুরোহিত।

সেখানে অদীক্ষিত পাঠকের প্রবেশ নিষেধ। বহু আগেই ১৮৬২ সালে 'শিল্পী' পত্রিকায় ক্ষমাহীন কাঠিন্যের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন : 'Toute chose sacrée et qui veut demeurer sacrée s'enveloppe de mystère...' (সব পবিত্র বস্তু এবং যা কিছু পবিত্র থাকতে চায় রহস্যে আবৃত)। তিনি দাবি করলেন নিখুঁত ও অমলিন এক ভাষা (une langue immaculée) যা সুবিধেবাদী পাঠকদের অন্ধ করে দেবে। ক্রমশ অনমনীয় হয়ে ওঠেন মালার্মে। তাঁর প্রথম দিকের কবিতার আপেক্ষিক স্বচ্ছতা মুছে যায়, তাঁর স্বপ্নকে আরও উঁচু তারে বাঁধার জন্য তিনি কবিতার তাৎক্ষণিক সুবোধ্যতাকে বর্জন করেন এবং গণপাঠককে কোনওরকম সুযোগসুবিধে দেওয়া নিষিদ্ধ করে দেন। এডমন্ড গস্-কে লেখেন, কবিতা তো খবরের কাগজের পৃষ্ঠা নয়।

মালার্মে চেয়েছিলেন কবি হয়ে উঠুন ক্রিয়াপদের জাদুকর। তিনি চেয়েছিলেন ভাষাস্থাপত্যের মধ্যে শুদ্ধ চিন্তার (idée pure) আলোকময় ক্ষমতাকে বন্দি করতে, যাতে তার ভেতর থেকে উৎসারিত হতে পারে নতুন এক তাত্ত্বিক। মালার্মে চেয়েছিলেন আপাত-দৃশ্যমানতাকে ভেদ করে প্রকৃত সারবত্তা (essence)-কে স্পর্শ করতে। যাতে গোলাপের আড়ালে অথবা গোলাপের মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে গোলাপের আদর্শ সত্তা।

'সাহিত্যের সিম্ফনি'-তে এইরকম দৃশ্যপট এঁকেছিলেন মালার্মে : একটি দোমড়ানো গাছ, যার বাকল একরাশ স্নায়ুশিরার মতো, যার স্নায়ুমুখকে তুলনা করা হয়েছিল বেহালার কান্নাভরা সুরের সঙ্গে, যা গাছের ডালের শেষ প্রান্তে একটি সংগীতের স্বরলিপির মতো কাঁপছে...। শোকার্ত অববাহিকা এক আবহমান ফুলের বাগানে ঢুকে পড়েছে : মৃত, ভারী, ধাতব জল, পেতলের ফোয়ারা, যেখানে আছড়ে পড়ে বেদনার্ত এক অদ্ভুত রশ্মি, মুছে যাওয়া মাধুর্য নিয়ে।

একদিক থেকে প্রতীকী অনুষঙ্গ-কে হয়তো শার্ল বোদল্যের-এর চেয়েও বেশি তীব্রতায় অনুসন্ধান করতে চেয়েছিলেন মালার্মে। অনুষঙ্গগুলোর একটিকে অন্যটির ওপরে সংস্থাপন করে দেন তিনি। অভাবনীয় দক্ষতায় মিলিয়ে-মিশিয়ে দেন। যেমন, স্বপ্নে দেখা দু'টি নারীশরীরকে যেন একটি রেখায় বিম্বিত হতে দেখে—দিগন্তে উন্মোচিত একটি শান্ত শুভ্র রেখা, যা একটি সুরমূর্ছনার মতো। এভাবে শিল্পের প্লাস্টিক গুণ ও সাংগীতিকতাকে এক স্বর্ণিল শূন্যতায় স্থাপন করা হয়।

১৬ নভেম্বর ১৮৮৫ সালে পল ভেরলেন'কে লেখা এক স্বীকারোক্তিমূলক চিঠিতে তিনি লেখেন :

> আমি সব সময় এক অ্যালকেমিস্টের ধৈর্য নিয়ে স্বপ্ন দেখি, যেমন সমস্ত ভণিতা ও তৃপ্তিকে বিসর্জন দিয়ে লোকে একসময় ঘরের আসবাব ও কড়িকাঠ জ্বালিয়ে দিত, তেমনি করে মহাশিল্পের উনুনে উৎসর্গ করতে... একটি বই, কারণ আমি নিশ্চিত যে বই একটিই, অচেতনভাবে যেই তা লিখুক না কেন...। বইটির ছন্দ (যা নৈর্ব্যক্তিক আর সজীব) থেকে পৃষ্ঠাসংখ্যা পর্যন্ত সেই স্বপ্ন বা ওড-এর সমীকরণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।
>
> প্রিয় বন্ধু, এই হল আমার পাপের নগ্ন স্বীকারোক্তি, যা আমি হাজার বার রক্তাক্ত, ক্লান্ত মনে প্রত্যাখ্যান করেছি, কিন্তু তা আমায় ভর করে থেকেছে, এবং হয়তো একদিন আমি সফল হব, গোটা বইটি লিখতে নয় (তার জন্য না জানি কী করতে হয়), অন্তত এক টুকরো নির্মাণ তুলে ধরতে যা বাস্তবতার গরিমায় ঝলমল করে উঠবে, বাকি সব কিছুর দিকে আঙুল দেখিয়ে যা বলে উঠবে ওসব একটি জীবনও টেকার নয়। ওই নির্মিত অংশগুলো দিয়ে প্রমাণ করা যাবে বইটির অস্তিত্ব, যা আমি চিনতে পেরেছি, কিন্তু শেষ করে উঠতে পারিনি।

এক উন্মীলীয়মান গ্রন্থের অসম্ভব স্বপ্নের সামনে দাঁড়িয়ে সাহিত্যকে বিনির্মাণ করেছিলেন তিনি।



কলকাতা শহরের মধ্যে যেন আরেক নতুন শহর গ্রীনল্যান্ড। দূষণহীন সবুজ পরিবেশ, কোলাহল থেকে অনেক দূরে। শান্তিপূর্ণ এই সবুজ নিকেতন গ্রীনল্যান্ড... তিন লক্ষেরও বেশী গাছ আপনাকে স্বাগত জানায়। সমস্ত আধুনিক সুযোগ-সুবিধাযুক্ত বাংলোয় রোজ আপনার ঘুম ভাঙবে পাখির ডাকে। আজই খুঁজে নিন আপনার সবুজ ঠিকানা। বুকিং শুরু হয়ে গেছে।

সুযোগ-সুবিধা: ২৪ ঘন্টা সিকিউরিটি | ছোটদের খেলাধুলার জায়গা | ইন্ডোর ও আউটডোর স্পোর্টস | স্যুইমিং পুল | ক্লাব হাউস মেম্বারশিপ

বিশদে জানুন: 033 6619 9999 / 2213 7249

Greenland
the eco village

info.kolkata@indiagreenreality.com
www.indiagreenreality.com

Bank of Maharashtra

কলকাতা ব্রাঞ্চ অফিস: বিএ-৩০, রাজডাঙা মেন রোড
কলকাতা - ৭০০ ১০৭, গীতাঞ্জলি স্টেডিয়ামের কাছে

কলকাতা সিটি অফিস: সেন্টার পয়েন্ট, ২১, হেমন্ত বসু সরণি, ৫ম তল
রুম নং ৪০৭, কলকাতা - ৭০০ ০০১, গ্রেট ইস্টার্ণ হোটেলের বিপরীতে

ABC

বিজ্ঞান, অজ্ঞান

যাঁরা বিজ্ঞান-সাধক, বিজ্ঞান-কর্মী—তাঁরা কি প্রত্যেকে বিশ্বাস করেন প্রাকৃতিক কার্যকারণের সূত্রেই জীবন আর বিশ্ব-ব্যাপারকে ব্যাখ্যা করা যায়, আর কিছুর দরকার নেই? যদি করেন, তা হলে এই ধারণা সাধারণ মানুষের মধ্যে কতটা পৌঁছেছে, সেটাও কি খতিয়ে দেখা উচিত নয়?



বছরের গোড়ায় কলকাতায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের শততম অধিবেশন হয়ে গেল। কত হাজার প্রতিনিধি এসেছিলেন, কত-শত প্রতিনিধি টাকাপয়সা পাঠিয়েও থাকার জায়গা পাননি এবং বিক্ষোভ দেখিয়েছেন, কতজন প্রবন্ধ পাঠ করেছেন, কতজন তা শুনতে-শুনতে ঘুমিয়েছেন বা হাই তুলেছেন, খাওয়াদাওয়ার কী ব্যবস্থা ছিল, কত জায়গায় অধিবেশন হয়েছে, মহামান্য রাষ্ট্রপতি আর প্রধানমন্ত্রী কী করেছেন, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী কী করেছেন, ছয়-ছয়জন নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত কী বলেছেন, শিশু আর নারীদের জন্য কংগ্রেসে নতুন করে কী করা হয়েছে—তার টক-ঝাল-মিষ্টি সমস্ত বিবরণ আপনারা খবরের কাগজে পড়েছেন। আমি সেসবের পুনরাবৃত্তি করতে যাব, সে ভয় করবেন না। এমনকী তরুণ ও প্রখর সাংবাদিক বন্ধুদের মতো আমি যে তার 'আঁখো দেখা হাল' বর্ণনা করব, সে-মুরোদও আমার নেই, কারণ আমার বিজ্ঞানের পাঠ ইস্কুলের সিলেবাস পেরয়নি।

সব দিক থেকেই এ এক এলাহি কাণ্ড। প্রতি বছরই এরকম অধিবেশন হয় তা ঠিক, কিন্তু তাই বলে এর গুরুত্ব কম করে দেখা ঠিক হবে না। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের কর্মকর্তারা এর জন্য অভিনন্দন দাবি করতেই পারেন। বহু বিজ্ঞানকর্মী ও গবেষক বহু দিন ধরে এই প্রতিষ্ঠানের একটি অত্যন্ত শক্তিশালী স্থাপত্য গড়ে তুলেছেন, তার ছত্রছায়ায় প্রতি বছর এই কংগ্রেসের মতো একটি বিপুল মহাযজ্ঞ এমন মহাসমারোহে নির্বাহিত হয়। এ বড় সামান্য, কৃতিত্ব নয়। লোকের মুখে শুনি ভারতের বিজ্ঞান-বাহিনী এখন পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় এবং দুর্ধর্ষ। ভারত চাঁদে উপগ্রহ পাঠিয়েছে, কালই খবর পেলাম মঙ্গল গ্রহেও উপগ্রহ পাঠানোর তোড়জোড় চলছে। এই সব চমকপ্রদ প্রদর্শনের পাশাপাশি কৃষিতে, ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভারতীয় বিজ্ঞানের সাফল্য তুচ্ছ করার মতো নয়। খুব বেশি নোবেল পুরস্কার আমাদের দেশে এখনও আসেনি যদিও, শুনি যে বেশ কয়েকটি ভারতীয়ের নাম নোবেল পুরস্কারের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করছে, এবং আমাদের অহংকারের কথা, তার মধ্যে একটি-দু'টি বাঙালি নামও আছে। বাঙালি বিজ্ঞানকর্মীরা সার্নে তথাকথিত 'ঈশ্বর কণা' নিয়ে কাজ করেছেন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের 'নাসা' বা 'নেসা'-তে তাদের মহাকাশ-গবেষণায় যুক্ত হয়েছেন—এসব খবর আমার অবৈজ্ঞানিক অশিক্ষিত কানেও এসে পৌঁছয়, আমি বিনামূল্যে বিনা-পরিশ্রমে বেশ খানিকটা বুক-ফুলে-ওঠা গর্ব অনুভব করি, 'জাগো বাঙালি' কিংবা 'বাঙালি গর্জে ওঠো' চিৎকারটা যাতে মুখ দিয়ে বেরিয়ে না-পড়ে, তার জন্যে অনেক কষ্টে মুখের ওপর হাত চাপা দিয়ে রাখি।

আমার বাঙালিত্বের অহংকারে একদিন আরও বেশি করে সুড়সুড়ি দিয়েছিলেন অধ্যাপক জয়ন্তবিষ্ণু নারলিকার। অন্য একটা কাজে তাঁর পুণের ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোফিজিক্স-এর অতিথিশালায় একবার থাকতে হয়েছিল। আমার সঙ্গীরা আগের রাতে তাঁর সঙ্গে সাধারণ আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। তাঁর তা মনে রাখার কথাও নয়। কিন্তু পরের দিন যখন ক্যাফেটারিয়া-য় প্রাতরাশ খেতে গিয়েছি তখন তিনি গুটিগুটি এসে আমার টেবিলে সামনের চেয়ারে বসলেন। আমি বাঙালি এই কথাটা তাঁর মনে ছিল, তাই আমেরিকান ব্রেকফাস্টের টোস্ট আর ওমলেট খেতে-খেতে তিনি নিজের জীবনের কথা বলতে শুরু করলেন। বললেন তাঁর বিজ্ঞান-শিক্ষা কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে, এবং তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে একজন বাঙালি অধ্যাপক ড. ভট্টাচার্যের কাছে তিনি বিশেষভাবে ঋণী, তাঁকেই তিনি তাঁর 'গুরু' বলে

মনে করেন। এ খবর শুনেই তো আমার আহ্লাদে চিত্তির হওয়ার কথা। কিন্তু তিনি সেখানেই থামলেন না। তারপরে যা বললেন তাতে আমার মাথা ঘুরে মেঝেতে পড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হল। তিনি আমাকে বললেন, বাঙালিদের মধ্যে প্রচুর বৈজ্ঞানিক তৈরি হয়। কেন জানেন?

আমার এই 'খবর'-টা এবং তার 'কারণ'—দু'টোর কোনওটাই জানার কথা নয়। বাঙালিদের মধ্যে প্রচুর কবির উৎপাদন হয় জানি, যা একসময় প্রয়াত বন্ধু শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে খুব বিরক্ত করে তুলেছিল। তারপর অবাঙালি বন্ধুরা বলেন বাঙালিরা রবীন্দ্রসংগীত গায়, তারা ব্যবসা-ট্যাবসার ধারে-কাছে নেই। তাই কথাটা শুনে বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে উত্তর দিলাম, জানি না।

তিনি বিজ্ঞান কংগ্রেসের খুব প্রশংসা করলেন, বললেন, মূলত বাঙালিদের চেষ্টাতেই এই অসাধারণ প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠছে, এবং তা যে ভারতীয় বিজ্ঞানের কী উপকার করেছে তা বলার নয়। কিন্তু আমি মূল কংগ্রেস নিয়ে কিছু বলছি না। আমি বহুবার গিয়েছি কংগ্রেসে, দেখেছি যে বাঙালি গবেষকরা তাঁদের ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে বিজ্ঞান কংগ্রেসে চলে আসেন। তাই হওয়া স্বাভাবিক। কারণ একটা নতুন জায়গায় আসছেন, শীতকালে, সেখানে সপরিবারে বেড়াতে আসার ইচ্ছে হওয়াটা অন্যায় নয়।

কিন্তু যেটা আমার চোখে পড়ে, আর আমি একটু অবাকও হই দেখে, ওই দশ-বারো বছরের ছেলেমেয়েরা বাবা-মায়ের সঙ্গে এসে ঘরে বসে থাকে না। তারা কংগ্রেসের অধিবেশনে চলে আসে, আর সামনের সারিতে চেয়ারে বসে পা দোলাতে দোলাতে বাবা-মা বা অন্যদের বিজ্ঞানের পেপার শুনতে থাকে। বড়রা আশেপাশে ঘুমোয় এমন দেখেছি আমি, কিন্তু এই বাচ্চাদের কখনও সে-কাজ করতে দেখিনি। আমার মনে হয়, বাঙালিদের মধ্যে বিজ্ঞানী বেশি করে তৈরি হওয়ার এটা একটা কারণ।

নারলিকার কথাটা ঠাট্টা করে বলেছিলেন এমন আমার মনে হয়নি। ফলে বিজ্ঞান-সাধনায় বাঙালি বেশ এগিয়ে গিয়েছে এইরকম একটা আবছা ধারণা সেদিন আমার মনে বদ্ধমূল হয়েছিল। এটাও আমার জানা ছিল যে, ভারতের বিভিন্ন গবেষণাগারে যেসব গবেষক বিজ্ঞানচর্চায় লিপ্ত আছেন, তাঁদের মধ্যে শতকরা ষাট ভাগই বাঙালি, পৃথিবীর অন্যত্র নানা গবেষণাগারেও বাঙালি বৈজ্ঞানিকরা চমৎকার কাজ করছেন, তারও অল্পস্বল্প খবর আমি রাখি। লেখাপড়ায় বাঙালি গোল্লায় যাচ্ছে, এ কথাটা মোটেই মুনি-ঋষিদের বেদবাক্য নয়।

২

তা না-হয় হল, কিন্তু এত বিজ্ঞান নিয়ে আমরা করছি কী? বিজ্ঞান এই গোচর বিশ্বজগতের বাইরে কোনও অন্য অস্তিত্ব স্বীকার করে না, বলে না যে প্রাকৃতিক শক্তি ছাড়া আর কোনও নিয়ন্তা শক্তি আছে। বলে না, এই প্রসার্যমাণ বিশ্বজগতের কোনও কুক্ষিতে 'স্বর্গ' বলে কোনও জায়গা আছে। 'ঈশ্বর'-কণাকে কুক্ষণে নির্বোধের মতো God Particle নাম দিয়েছিলেন কেউ, তা নিয়ে যথেষ্ট সংবাদমাধ্যমিক জলঘোলা হয়েছে। কে না জানে যে তার সঙ্গে তথাকথিত ঈশ্বরের কোনও সম্বন্ধ নেই, আর তা থাকলে যেমন ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না, না-থাকলেও হয় না। কিন্তু দেখলাম বিজ্ঞান কংগ্রেস সম্বন্ধে সাংবাদিক বন্ধুদের প্রতিবেদনে নানা জিনিসই এসেছে—বৈঠকখানা ঘরের খবর, রান্নাঘরের খবর। মহিলা বিজ্ঞান কংগ্রেসে মহিলা-শ্রোতা (শ্রোতা-ই লিখলাম, আগে

মহিলা আছে বলে স্ত্রীলিঙ্গ ধরে নিতে হবে, মহিলা ডাক্তারের মতো) ছিলেন না, চেয়ারগুলোই ছিল শ্রোতা, সে খবরও তাঁদের চোখ এড়ায়নি। কিন্তু একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস নজর এড়িয়ে গিয়েছে বলে আমার মনে হল, কিংবা তাঁরা ব্যাপারটাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেননি হয়তো। তা হল, বহিরাগত বিজ্ঞানগবেষক ও প্রতিনিধিদের মধ্যে কতজন, অধিবেশনের ফাঁকে বা পরে কালীঘাটে ছুটেছেন পুজো দেওয়ার জন্যে, কিংবা দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ভোগ খেয়েছেন। কলকাতায় এসেছেন, কালীদর্শন করবেন না?

আমি জানি, আমি এখন একটা বিতর্কমূলক অঞ্চলে প্রবেশ করছি। আমি নিজে ধর্মমুক্ত মানুষ বলে নিজেকে গণ্য করি, তার মানে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকর্ম আমি মানিও না, তার কোনও আচরণও করি না। তাই বলে মানুষ ধর্মকর্ম করা ছেড়ে দেবে, এমন কথা বলারও আমার ইচ্ছে বা সাধ্য নেই, আর আমি বললেই বা শুনছে কে! আমি তো আমি, আইনস্টাইনের মতো বিজ্ঞানীরা বলে গিয়েছেন ঈশ্বর আর প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিরুদ্ধে, বলে গিয়েছেন অজস্র দার্শনিক, কিন্তু তাঁদের কথায় কান দেওয়ার সামান্যই লোক জুটেছে। আমি আলাদা করে বলছি, বিজ্ঞান-সাধক আর বিজ্ঞান-কর্মীদের কথা। তাঁরা কি প্রত্যেকে বিশ্বাস করেন যে প্রাকৃতিক কার্যকারণের সূত্রেই জীবন আর বিশ্ব-ব্যাপারকে ব্যাখ্যা করা যায়, আর কিছুর দরকার নেই? এ ধরনের বিজ্ঞান-কংগ্রেসে তার কোনও বার্তা থাকা দরকার? কিংবা স্কুলে-কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের বিজ্ঞানের পাঠ্যক্রমে বিজ্ঞানের তত্ত্ব আর প্রয়োগশিক্ষার সঙ্গে কুসংস্কার-প্রতিরোধের শিক্ষাও আবশ্যিকভাবে যোগ করা দরকার? যদি থাকে, নিশ্চয়ই এসব অবিশেষজ্ঞের বিষয় নিয়েও বিজ্ঞান কংগ্রেস ভেবেছে প্রায়ই, কিন্তু তা মানুষের কাছে কতটা পৌঁছেছে?

তা যদি পৌঁছত, তবে আমাদের দেশে সমাজের স্তরে-স্তরে কুসংস্কার এমন মজ্জাগত কেন? এখানে বৃষ্টি নামানোর জন্য কুকুরের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেওয়া হয়, বিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নেও সতীদাহে পুড়ে যায় রূপ কানোয়ার, পাঁজিগুলো দাড়িওয়ালা, দাড়িহীন, ভুঁড়িদার, ক্ষীণভুঁড়ি, রক্তাম্বর, শ্বেতাম্বর জ্যোতিষী-গণকের বিজ্ঞাপনে এত ঠাসা কেন? অতি বৃহৎ লম্বা লাল মুলোর, আর পর্বতাকার ফুলকপির বিজ্ঞাপনকে তারা নির্বাসন দিয়ে নিজেরা তার জায়গা দখল করে নিয়েছে, এতে ছোটদের পঞ্জিকা দেখার আদ্ধেক সুখ মাটি হয়ে গিয়েছে। শনিঠাকুর এখন প্রতিটি রিকশো-স্ট্যান্ডে জাঁকিয়ে বসেছেন, সন্তোষী মা সিনেমার কল্যাণে নতুন অবতার হয়ে বসলেন, আগেকার দেবতারা তাঁর নাম জানত কিনা সন্দেহ। এখনও হাঁচি-কাশি-টিকটিকি -কোষ্ঠী বহু মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে, মুখে অনেকে বস্তুবাদী দর্শনে বিশ্বাসের কথা বললেও। এদেশে বিয়ের আগে রক্তপরীক্ষা না করে যোটকবিচার হয়, ভাবী সন্তানের জন্য থ্যালাসেমিয়া সম্ভাবনা তৈরি করে। এসব নিয়ে বিজ্ঞান কংগ্রেস বা বিজ্ঞানীদের প্রতিদিন কোনও বার্তা থাকা দরকার।

আমার ভয় হয়, যখন অনেক বিজ্ঞানীর হাতে, ডাক্তারের হাতে, ইঞ্জিনিয়ারের হাতে আমি একাধিক গোমেদ-নীলা-পোখরাজ-প্রবালের 'ধারণের আংটি' দেখি। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ভাঙল যে রাজনৈতিক শক্তি, তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন মেঘনাদ সাহা-র কাছে ডক্টরেট করা ফিজিক্স-এর অধ্যাপক, যিনি পরে ভারতের শিক্ষামন্ত্রীও হয়েছিলেন। তিনি কপালে ফোঁটা-তিলক কাটতেন, সম্ভবত টিকিও রাখতেন। সত্তর দশকে দেখা হয়েছিল এক আগুন-খেকো বিপ্লবী অধ্যাপকের সঙ্গে, যিনি থিসিস কবে জমা দেবেন তার শুভলগ্ন সন্ধানের জন্যে গিয়েছিলেন বউবাজারে জ্যোতিষীর ঘরে। তা হলে সাধারণ মানুষ কার কাছে সব প্রশ্নের উত্তর চাইবে? বিজ্ঞানী কি সেই জায়গাটা নিতে এগিয়ে আসবেন না? ও জায়গাটা তো তাঁরই। জানি না, শিশু আর নারী-বিজ্ঞানীদের সম্মেলনের ব্যবস্থা করে তাঁরা এই জায়গাটাই ধরতে চেয়েছিলেন কিনা।

এক স্কুলের বিজ্ঞান-প্রদর্শনীর কথা আমি আগে অন্যত্র লিখেছি। এই শীতকালে প্রচুর এ ধরনের প্রদর্শনী হয়। যখন পদাধিকারী ছিলাম, তখন তার উদ্বোধনে এই অবিজ্ঞানীরও ডাক পড়ে। তাতে স্কুলের ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা চমৎকার সব মডেল তৈরি করে, আর সেই মডেল নিয়ে অসাধারণ বক্তৃতা বা ব্যাখ্যা দেয়। কোথাও রিমোট কন্ট্রোলে আগুন জ্বলছে, কোথাও ফোয়ারা ছুটছে, কোথাও চাকা ঘুরছে—আমি রীতিমতো মুগ্ধ হয়ে দেখেছি, আর শুনেছি এই সব ঝকঝকে ছেলেমেয়েদের প্রদর্শন-ভাষণ।

একবার কী দুর্মতিবশত একজনকে তার বক্তৃতা থামিয়ে জিগ্যেস করেছিলাম, 'বাঃ, সবই খুব সুন্দর। নিশ্চয়ই তুমি বড় হয়ে মস্ত বৈজ্ঞানিক হবে। কিন্তু বাপু, আমাকে বলো তো, ভূত আছে কি না?'

সে খানিকটা থমকে গেল। তারপর মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ আছে।'

আমি আবার জিগ্যেস করলাম, 'কোথায় আছে? কীভাবে ভূত হয়?'

সে বলল, 'ওই যারা অপঘাতে মরে, তারা ভূত হয়।'

আমি আরও মজা দেখার জন্যে বললাম, 'তা এই যে এত মশামাছি-মাছমুরগি-পাঁঠাভেড়া-কুকুরবেড়াল অপঘাতে মরছে, হয় আমরা মারছি, না-হয় অ্যাক্সিডেন্টে মরছে—এরাও সকলে কি ভূত হবে?

ছেলেটিকে এবার একটু দ্বিধাগ্রস্ত মনে হল। তবু সে বলল, 'হ্যাঁ, এদেরও ভূত হবে।'

আমি নাছোড়বান্দার মতো লেগে রইলাম, 'তা, এত ভূত আছে কোথায়, যাবে কোথায়?'

এমন সময় তার দাদারা তার কাছে চলে এল, বলল, 'স্যর, ও ছেলেমানুষ, কী বলতে কী বলবে!' কথাটা শুনেই আমি থেমে গেলাম। কিন্তু আমার ভয় হল, ছেলেটি যদি বিজ্ঞানে অনেক এগিয়ে যায়, তা হলে কি এই বিশ্বাসটা ও ছাড়তে পারবে?

আমি অবশ্য এমন কথা বলি না যে, আমরা তৃতীয় বিশ্বের লোকরাই শুধু ভূতপ্রেত-দেবতা-অপদেবতায়-জ্যোতিষে-তন্ত্রে-টোটকা-অভিচারে আর অজস্র কুসংস্কারে বিশ্বাস করি। আমেরিকার মতো 'শিক্ষিত' দেশেও প্রচুর কুসংস্কার আমি দেখেছি। সেখানে মেয়েরা কলেজে নতুন ক্লাসে পরিচিত হলে বলে আমার রাশি তুলা, তোমার কী? সেখানে কিছুদিন আগেও ক্যাথলিকদের 'প্যারোকিয়াল' স্কুলে পড়ানো হত সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে, আর পৃথিবী একটি সমতল জায়গা, বাড়ির ছাদের মতো। শিক্ষকরা বলতেন, বাইরে তোমরা অন্যরকম শিখবে। সেখানে আছে ক্রিয়েশনিস্ট দলবল, যারা বিশ্বাস করে, দশ হাজার বছর আগে একদিন সকালে ঈশ্বর এই পৃথিবীটা বানিয়েছিলেন, ডারউইন-টারউইন সব মিথ্যে। তারা আমেরিকান সরকারের কাছে দাবি করেছিল, তাদের এই গুলতাপ্পির শাস্ত্র স্কুলে পাঠ্য করার জন্যে। আমেরিকার সরকার সে কথা শোনেনি বলে তারা এখনও আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াইটা সব দেশে প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্তের লড়াই। এটা শুধু অশিক্ষার বিরুদ্ধে, নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে লড়াই নয়, কয়েক হাজার বছরের অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে লড়াই। এ লড়াইয়ে হারলে আমরা আধখানা মানুষ থেকে যাব। বিজ্ঞানীরা মহাকাশে যাবেন অবশ্যই, তাতে আমাদেরই গৌরব, কিন্তু তাঁরা মাটিতে থেকেও আমাদের সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধ করুন। এ লড়াইয়ের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র তাঁদেরই হাতে, তাঁরাই নির্মাণ করেছেন। তাঁর নাম যুক্তি।

এই যুদ্ধে আমরা প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে বিজ্ঞানসাধকদের আমাদের পাশে চাই। অনেক অনেক বেশি করে।

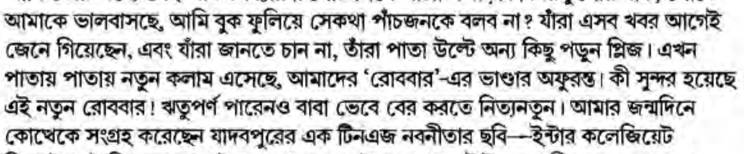

অভিযান-এর বই
কলকাতা বইমেলায়
অভিযান-এর
স্টল নং
৪০৪
২০১৩ কলকাতা বইমেলায় প্রকাশিত
অভিযান-এর নতুন বই
আচার বিচার সংস্কার নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি ১০০
কেন গড়ে উঠেছিল সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার? হারিয়ে যাওয়া আচার বিচার বর্তমান জীবনে কীভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে তার গভীর বিশ্লেষণ ও সঙ্গে বুদ্ধিদৃপ্ত রসিকতায় তৃপ্ত হবেন পাঠক।
রবীন্দ্রনাথ ও মানুষের ধর্ম (প্রবন্ধগ্রন্থ) গৌতম নিয়োগী ২৫০
বাঘ শিকারী রাজামশাই রতনতনু ঘাটী (ছোটোদের গল্প) ৬০
তর্কে তক্কে সা'আদুল ইসলাম (প্রবন্ধ সংকলন) ২০০
জীবনচরিতে প্রবেশ দেবেশ রায় (উপন্যাস) ২০০
শৈলীতত্ত্ব ও ছোটোগল্পে জীবনানন্দীয় শৈলী
ঝন্টু দাস ৩০০
জসীম উদ্দীন: জীবন ও সাহিত্য
সম্পাদনা এন জুলফিকার ৪০০
পল্লিকবিতার ঘ্রাণ যে কবির কবিতার প্রধান বিষয় সেই জসীম উদ্‌দীনের জীবন ও সাহিত্য সাধনার নানান দিক নিয়ে দু-বাংলার স্বনামধন্য গবেষক ও প্রাবন্ধিকদের গদ্য ও প্রবন্ধের সংকলন।
এই প্রথম বাংলাদেশে প্রকাশের আগেই পশ্চিমবঙ্গে প্রকাশিত হল
হাসান আজিজুল হক-এর টান
দু-বাংলার খ্যাতনামা সাহিত্যিক হাসান আজিজুল হকের নবতম গদ্যগ্রন্থ। ৮০
ছোটোবেলার প্রিয় শখ ২২৫
বিখ্যাত মানুষদের ছোটোবেলার প্রিয় শখ এবং আজকের ছোটোদের প্রিয় শখ নিয়ে একটি সংকলন
মুনলাইট সোনাটা অমর মিত্র ১৫০
মুনলাইট সোনাটা ও এখন মৃত্যুর ঘ্রাণ - এই দুই উপন্যাস নিয়ে এই বই। দুটি উপন্যাসই বলেছে ক্ষমতার অলিন্দে বিচরণ করা মানুষের কথা। এই দুই উপন্যাস সেই ক্ষমতা অর্জন আর ব্যবহারের নানা বিন্দুকে নানা ভাবে ছুঁয়েছে।
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রেমের গান
সংকলন ও সম্পাদনা শান্তি সিংহ ১৫০
গানগুলির প্রয়োগ ও তার সঠিক প্রেক্ষিত বিশদভাবে আলোচিত। শিল্পী নূপুরছন্দা ঘোষের পরামর্শে একগুচ্ছ স্বরলিপি সংযোজিত।
অনুগল্প সংগ্রহ স্বপ্নময় চক্রবর্তী
গল্পের একটা ফর্ম এই 'অণুগল্প' বর্তমানে পাঠকেরা বিশেষভাবে সমাদর করে থাকে। বিখ্যাত গল্পকার স্বপ্নময় চক্রবর্তীর কলমে বারবার এমন অনেক গল্পের স্বাদ পাওয়া যায়। তারই সংকলন এই গ্রন্থ।
পাতার পরিজন পল্লব কীর্ত্তনীয়া ১২৫
পল্লব কীর্ত্তনীয়াকে আমরা চিনি এক বিশিষ্ট প্রতিবাদী গায়ক হিসাবে। কিন্তু লেখক হিসাবেও তাঁর সুনাম বহুল প্রচারিত। পাতার পরিজন গ্রন্থে তাঁর ব্যক্তিগত কিছু রচনা যা ভিন্ন স্বাদের, যেখানে পাঠক পেয়ে যাবেন অন্য এক জগত।
বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ গল্প
১৯৪৭ থেকে ২০০৭ — এই ৬০ বছর বাংলাদেশের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য কালখন্ড। দেশভাগ, ভাষার লড়াই, স্বাধীনতা যুদ্ধ, স্বাধীনতা উত্তর অস্থির রাজনৈতিক পরিবেশ এ-সবই উঠে এসেছে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ গল্পের এই মহৎ গ্রন্থে।
সম্পাদনা সাদ কামালী ৪০০
দুবাংলার আকাশ ও মাটি
বিমলেন্দু মজুমদার ৪০০
বাংলাদেশের পটভুমিকায় লেখা এক বৃহৎ উপন্যাস। ছেড়ে আসা মাটির যন্ত্রণার কথা।
পার্ল রহস্য রবিশংকর বল
এটি প্রথামাফিক কোনো গোয়েন্দা গল্প নয়। আবার গোয়েন্দা গল্পও বটে। একটি মনস্তাত্ত্বিক ট্রিটমেন্ট এই উপন্যাসটির মূলকেন্দ্র। কিন্তু তা জটিলতাহীন। পাঠক একবার পড়া শুরু করলে তা শেষ না করে উঠতে পারবেন না।
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
সে কি খুঁজে পেল ঈশ্বর কণা ১০০
আলো, আরো আলো ৬০
নিরীশ্বর পাখীদের উপাসনালয়ে ১০০
শোনো জবাফুল আলোক সরকার ১০০
আঁধার পরিধি একরাম আলি ১০০
অভিযান পাবলিশার্স
৬৪/১ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩
+৯১ ৮০১৭০৯০৬৫৫
email: abhijan_publishers@rediffmail.com
Abhijan Publishers on Facebook:
www.facebook.com/abhijanpublishers

আমার দুই পাশে বসেছিলেন আমার অতি প্রিয়, পরম শ্রদ্ধেয় অশোক মিত্র, তপন রায়চৌধুরী, শঙ্খ ঘোষ আর অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। সময় নষ্ট করে তাঁদের আসা কেন? কেননা নবনীতার যে পঁচাত্তর হল!

অহর্নিশ জন্মদিনের হইচই : ভালো-বাসার বারান্দায়, ১৫ জানুয়ারি ২০১৩

ঠিক আছে, ব্যাপারখানা তবে বলেই ফেলি ভুলে যাওয়ার আগে। লজ্জার মাথা খেয়ে নিজেই নিজের জন্মদিনের অপরূপ গপ্পোটা শোনাই আপনাদের, যাদের কান নিশপিশ করছে ওই গপ্পোটা শুনতে (কান কি নিশপিশ করে হাতের মতন?)। বাংলা অকাদেমিতে 'অহর্নিশ'-এর আশ্চর্য সভাতে সেদিন না ছিল কোনও কাগজের লোক, না ছিল টিভি, না রেডিও। আয়োজকরাও আলোচনা রেকর্ড করার ব্যবস্থা করেননি। ভিডিওর তো প্রশ্ন ওঠে না। এত সুন্দর সুন্দর মানুষ এসে ৭৫ বছরের এই ছেলেমানুষটাকে আশীর্বাদ করলেন, মনের বাইরে তার কোনও চিহ্ন রইল না। প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন কেবল অঢেল প্রিয়জন, যাঁরা আমার লেখা ভালবেসে সেদিন সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁদের স্মৃতিই ভরসা। পরের দিন কোদালিয়া থেকে আমার বন্ধু জনা ফোন করে ফোঁস করে উঠল। সে তার আগের দিনই এসে খুব গান গেয়ে, ছড়া লিখে, শাড়ি পরিয়ে, বাড়িসুদ্ধ সবাইকে উপহার দিয়ে বন্ধুর জন্মদিন করে গিয়েছে। তার ছড়িয়ে পড়া ক্যানসারকে সে গেরাহ্যি করে না, আধখানা ফুসফুস নেই, আরও অনেক কিছুই নেই বুকের, তো কী, ভালবাসা তো আছে, ঝগড়া করবে না? দু'মাস পরে তারও, ইনশাল্লা, ৭৫ পূর্ণ হবে।

—'এ কী কথা, লোকমুখে শুনলুম অতীব সুন্দর জমায়েত হয়েছিল, অসাধারণ সব মানুষ এসেছিলেন, অথচ কোনও কাগজেই কোনও খবর নেই? আমরা জানব কেমন করে? সাংস্কৃতিক সংবাদ মানে কি কেবল হলিউড, বলিউড, আর টলিউড? ঠিক আছে কুছ পরোয়া নেই, তুমি নিজেই গুছিয়ে লেখো দিকিনি সবটুকুনি তোমার 'রোববার'-এর কলামে, আমরা যারা যেতে পারিনি, কিন্তু মনে মনে উপস্থিত ছিলুম, আমাদের তৃপ্তির জন্যে।' বেশ, জনা, তোর কথাই রইল। আমি তোর জন্যে সেই আনন্দসন্ধ্যার রিপোর্ট লিখে পাঠাচ্ছি দাঁড়া। বিনয় চুলোয় যাক, লোকে আমাকে ভালবাসছে, আমি বুক ফুলিয়ে সেকথা পাঁচজনকে বলব না? যাঁরা এসব খবর আগেই জেনে গিয়েছেন, এবং যাঁরা জানতে চান না, তাঁরা পাতা উল্টে অন্য কিছু পড়ুন প্লিজ। এখন পাতায় পাতায় নতুন কলাম এসেছে, আমাদের 'রোববার'-এর ভাণ্ডার অফুরন্ত। কী সুন্দর হয়েছে এই নতুন রোববার! ঋতুপর্ণ পারেনও বাবা ভেবে বের করতে নিত্যনতুন। আমার জন্মদিনে কোত্থেকে সংগ্রহ করেছেন যাদবপুরের এক টিনএজ নবনীতার ছবি—ইন্টার কলেজিয়েট ডিবেটের ট্রোফি বুকে জাপটে ধরে আহ্লাদে আটখানা। থ্যাঙ্ক ইউ ঋতু! কী সুন্দর করে, কত ভালবেসে লিখেছ আমাকে নিয়ে, আমি মোটেই এত ভাল ভাল কথার যোগ্য নই। কী সুন্দর ছবি-টবি দিয়ে 'প্রতিদিন'-এর 'ছুটি'-র পাতায় আমার কথা লিখেছেন চৈতালি আর শুভাশিস। এই শুভাশিস-ই কিন্তু 'অহর্নিশ'-এর সম্পাদক। 'অহর্নিশ' আর 'ক্র্যাকার'—মফস্‌সলের দু'টি ছোট কিন্তু আত্মসচেতন সাহিত্যপত্র, তাঁরা আমাকে ব্যক্তিগতভাবে চেনেনও না, আমি কোনও কাগজের সঙ্গে জড়িয়ে নেই, কোনও বড় সংস্থার সঙ্গেও না, বিজ্ঞাপনও জোগাড় করে দিতে পারি না—মোট কথা, তাঁদের কোনও উপকারে লাগব না। নিঃস্বার্থ ভালবেসে কত খরচ করে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঁরা আমার জন্মদিন উদ্‌যাপন করলেন। অতি সুন্দর ছবিওলা খাম ও কার্ড ছেপেছেন, হল ভাড়া করেছেন, দিল্লি থেকে ধীরঞ্জন দাশগুপ্ত (রিন্টু)-কে দিয়ে দু'রকমের স্কেচ ছবি আঁকিয়েছেন আমার, আবার 'প্রণতিপত্র' নামে একটি সুশ্রী লিফলেট ছেপে বিলি করেছেন, তাতে আছে বিশ্বজিৎ রায়ের কবিতাগুচ্ছ, আর পাতায় পাতায় নবনীতার স্কেচ, আর নবনীতার কবিতার উদ্ধৃতিসমেত গ্রন্থপঞ্জি, জীবনপঞ্জি ইত্যাদি। সবই নিজেরা সংগ্রহ করেছেন। আমাকে জ্বালাতন করেননি। সত্যি খুব অবাক করা ছেলেমেয়ে এই সোমা-শুভাশিস। তাঁদের মঙ্গল হোক। এই শ্রদ্ধা, এই ভালবাসাই জীবন তাঁদের দ্বিগুণ করে ফিরিয়ে দিক।



'অহর্নিশ'-এর কল্যাণে সেদিন মঞ্চের পটভূমিতে ছিল ছবিসমেত 'নবনীতা ৭৫' সুশ্রী ফ্লেক্স, আর মঞ্চে আমার দুই পাশে বসেছিলেন আমার অতি প্রিয়, পরম শ্রদ্ধেয় চারজন মানুষ। অশোক মিত্র, তপন রায়চৌধুরী, শঙ্খ ঘোষ আর অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। সময় নষ্ট করে তাঁদের আসা কেন? কেননা নবনীতার যে পঁচাত্তর হল! চারজনেই খুব সুন্দর বললেন। কে কী বললেন? ভারী কথা কিছু নয়। শুধু একটা কথাই এবং সেটাই জীবনের সব চাইতে জরুরি কথা, দু'ঘণ্টা ধরে ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল ধূপের সুবাসের মতো—এই, যে, তাঁরা সবাই আমাকে খুব ভালবাসেন। অশোকদা অল্পই বললেন, শরীর একটুও ভাল ছিল না তাঁর। তবু নিজের উদ্যোগে এসে সর্বক্ষণ আমার পাশে বসেছিলেন, আমার মহা সৌভাগ্য। অশোকদা বললেন, 'ছোটবোনের জন্মদিনে বড় দাদা হয়ে কী আর বলব, গত পঞ্চান্ন বছরের বেশি সময় ধরে আমি ওকে চিনি, ও আমাকে চেনে, ও আমার বোন, আমি ওর দাদা। আমার সুখ-দুঃখের ভাগীদার হয়েছে ও, আমিও ওর দুঃখ-সুখের ভাগীদার হয়েছি, সবসময়ে ও আমার পাশে থেকেছে, আমিও সাধ্যমতো থেকেছি ওর পাশে। ওর ভাল হোক। আমি জানি নবনীতা সুন্দর গদ্য লেখে কিন্তু আমি চাইব সে এখন থেকে মন দিয়ে শুধুই কবিতা রচনা করুক, কেননা আমি জানি, ও সব কিছুর আগে মূলত কবি।'

তপনদাও কম যান না, জানালেন, তাঁর সঙ্গেও আমার পঞ্চান্ন বছরের বেশি দিনের দীর্ঘ স্নেহের সম্পর্ক। তারপর অক্সফোর্ডে নীরদচন্দ্র চৌধুরীর বাড়িতে নবনীতার প্রথম পদক্ষেপ করার গল্পটা তারিয়ে তারিয়ে শোনালেন।

—'নবনীতা ভিতরে গিয়ে সমানেই দাঁড়িয়ে রইল। নীরদবাবু তাকে বসতে বললেন। নবনীতা বলল, 'আপনি আমার বন্ধুকে বাড়িতে ঢুকতে অনুমতি দেননি সে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, আমি বসব কেমন করে?' তপনদা নাম করেননি, কিন্তু এটা গোপন কথা নয়, তাই আমিই বলে দিচ্ছি, তিনি বাইরে দাঁড় করিয়ে (গাড়িতে বসিয়ে) রেখেছিলেন কেতকী কুশারী ডাইসনকে। তার কারণ, তার ঠিক আগেই 'দেশ' পত্রিকার পাতায় দু'জনের প্রবল বিতর্ক হয়েছিল। 'বাঙালির মুসলমান পোশাক' বিষয়ে নীরদবাবুর একটি প্রবন্ধের বক্তব্যের ঘোরতর আপত্তি করে চিঠি দিয়েছিলেন কেতকী। উত্তরে নীরদবাবু নবনীতাকে বললেন, 'তবে শুনুন, আপনার বন্ধু আমার লেখা পছন্দ করেন না, আমাকেও পছন্দ করেন না, তাঁকে আমি কেন আমার বাড়িতে ঢুকতে দেব বলুন তো?' নবনীতার আর কিছু বলার রইল না। তারপরে তিনি ওকে জিগ্যেস করলেন, 'আপনার কী করা হয়?'—'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াই।' শুনে নীরদবাবু বললেন, 'ওটি একটি ধাপ্পা।' তারপরে বললেন, 'কী পড়ানো হয়?'—'কমপ্যারেটিভ লিটারেচার।'—শুনে আবার বললেন,, 'ওটি আর একটি ধাপ্পা।' তখন বেশ শান্তভাবেই নবনীতা বিনয়ের সঙ্গে বলল, 'আপনি মহান পণ্ডিত, আপনার কাছে কথা বলতেই সংকোচ হচ্ছে, আপনার তুলনায় আমি সেই সমুদ্রতীরে নুড়ি কুড়োচ্ছি, কিন্তু আমি তো ১৬ বছর থেকে ৩৬ বছর অবধি ২০ বছর ধরে একটাই জিনিসের চর্চা করছি, তাই আপনিও নিশ্চয়ই মানবেন যে অন্তত এই একটা বিষয়ে আমার জ্ঞান আপনার চেয়ে বেশি নিটোল? অতএব ধাপ্পা-টাপ্পা বলবেন না, আপনি তো জানেন না ঠিকঠাক কমপ্যারেটিভ লিটারেচার ব্যাপারটা কী? আমি জানি।' এর উত্তরে নীরদবাবু সত্যিই চুপ করে গিয়েছিলেন, যেটা তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ। পরের দিন নীরদবাবু আমাকে ফোন করে বললেন, 'কালকের মহিলাটি বেশ দজ্জাল মহিলা ছিলেন কিন্তু।' (তপনদা মিষ্টি হেসে বললেন) আমি বললাম, 'হ্যাঁ, তা একটু দজ্জাল মেয়ে আছে বটে ও!' তপনদার এই গল্প সকলেই খুশি হয়ে শুনলেন, নীরদবাবুর প্রসঙ্গ সদা-সর্বদাই বাঙালির মনোরঞ্জন করে। এরপরে তিন নম্বরে বলতে উঠলেন জার্মানি-প্রবাসী কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, অলোকদা আমার মাস্টারমশাই। উনি যাদবপুরে তখন তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন, অমর্ত্যর-ই সমবয়সি এবং সহকর্মী। ওঁরা একইসঙ্গে পড়েছেন শান্তিনিকেতনে, প্রেসিডেন্সিতেও। অমর্ত্য যাদবপুর ছেড়ে কেমব্রিজে যাওয়ার সময় ছাত্রদের দেওয়া ফেয়ারওয়েলে অলোকদা গান গেয়েছিলেন—'ভরা থাক স্মৃতিসুধায় বিদায়ের পাত্রখানি।' খুব ভাল শিক্ষক ছিলেন অলোকদা, অনেক উপকৃত হয়েছি। অলোকদা এক চিমটি গল্প শোনালেন আমার তুলনামূলক সাহিত্যপাঠের দিনগুলির।—'তবে আমিও একটু ওই দজ্জালিকার গল্প বলি। ক্লাসের মধ্যে নবনীতা কফি বানাচ্ছে, আমরা কফি খেতে খেতে গল্প করতে করতে ক্লাস নিচ্ছি, ঘণ্টা পড়ে গিয়েছে, আর বাইরে ক্লাস নিতে এসে দাঁড়িয়েছেন দীর্ঘদেহী সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। নবনীতা বললে, 'আচ্ছা, ওঁকে কি আমরা এবারে ঢুকতে দেব?' এতটাই দজ্জাল ছিল!' অলোকদা বললেন, 'বিশ্বে তুলনামূলক সাহিত্যের পঠনপাঠনের তখন ফরাসি আর মার্কিন—এই ধারা দু'টো ছিল, নবনীতার কাজ আলাদা একটি ভারতীয় ধারার সৃষ্টি করেছে। সেটা বিদেশে স্বীকৃতি পেয়েছে।' স্নেহের জন্যে বানিয়েই বলুন আর সত্যের খাতিরেই বলুন, কথাগুলো শুনে কৃতার্থ বোধ করেছি। অলোকদা সঙ্গে করে এনেছিলেন ছোট্ট একটি কাঁসার রেকাবে বসিয়ে একটা এত্তুটুকুনি মাটির কুনকে আর বিনুনি বোনা সোনালি ধানের গুচ্ছ, তাজা সবুজ দূর্বাঘাস। আমাকে আশীর্বাদ করবেন বলে এই প্রস্তুতি। (কাজ ফুরলে সেগুলো আমার উপহার মনে করে আমি নিয়ে নিয়েছি!) অলোকদা কিন্তু আশ্চর্য মানুষ! পারেনও বাবা! তাঁর নিজেরই বয়েস এবারে আশি হচ্ছে, সদ্য বিদেশ থেকে এসে এতসব দিশি খুঁটিনাটি ভেবেচিন্তে, কলকাতা শহরের মধ্যে বসে জোগাড়যন্তর করা তো সহজ নয়? সময় লেগেছে তো! আমি আপ্লুত। এই পঁচাত্তর বছর বয়সেও যে কোনও তুচ্ছ মানুষ অন্য কারওর অন্তরের আশীর্বাদের যোগ্য থাকে, সেটা টের পেয়ে সেদিন ধন্য হয়ে গিয়েছি। অপ্রশস্ত মঞ্চে পরপর চারজন প্রণম্য মানুষকে বাগে পেয়ে, মনের সুখে টিপটিপ করে পাবলিকলি পেন্নাম ঠুকে দিলুম। ওঁদের যার যতই লজ্জা করুক, মঞ্চের ওপরে তো 'না, না, থাক, থাক' লাফালাফি করে নাটক করতে পারবেন না! এইসব বিনয়ের অবতার—শঙ্খদা, অশোকদা, তপনদারা। সাম্যবাদী অশোকদা তো প্রণাম থেকে শত পদক্ষেপ দূরে পালান। কিন্তু এখানে সে সুযোগ ছিল না তাঁর। দর্শকের নজরবন্দি অবস্থায় প্রত্যেকে ধান, দূর্বা হাতে নিয়ে দিব্যি অভ্যস্ত স্টাইলেই আশীর্বাদ করে দিলেন শতাব্দীর তিন ভাগ পার করে দেওয়া তাঁদের স্নেহের কচি খুকিটিকে। রোজ রোজ বন্ধুদের তালিকা তৈরি করি—কে কে আছে, কে কে নেই। বন্ধুরা বড় চটপট চলে যাচ্ছে। আড্ডা দেব কাদের সঙ্গে? আমি তাই এখন অল্পবয়সি বন্ধুবান্ধব করছি, যারা আমার আগে মারা যাবে না। বেশ কিছুদিন আড্ডা, মস্তি করতে পারব। বুড়ুটে সঙ্গ সর্বদা প্রীতিকরও লাগে না আমার। আমার অনেক সমবয়স্ক বন্ধুর এখন সেই দুরবস্থা হয়েছে। খালি খালি পুরনো দিনের দিকে চেয়ে থাকা আর বর্তমান নিয়ে হাহুতাশ করা। অসুখের ফিরিস্তি। অক্ষমতার হাহাকার। সত্যি বেশ বোর করে দেয়। 'কেমন আছ' জিগ্যেস করেছ কী গ্যাছো! আরে, বেঁচে থাকলে বয়স বেড়েই চলবে, বাত হবে, চুল পাকবে, যৌবন পড়ে থাকবে পিছনে। আমরা তো গাছ নই যে বছরে বছরে বসন্ত ফিরে আসবে! মানুষের সময় তো সামনের দিকেই এগিয়ে চলে। সামনের পথের দিকে চাইতে হবে না? সেসব সামনে চাওয়ার কথা শুনব কাদের কাছে? বুড়োরা তো ভুলেই বসে থাকে সামনের রাস্তা। তাই তো চাই অল্পবয়সের বন্ধু, যারা স্বপ্ন দ্যাখে। স্বপ্নের ভাগ দেয়। মনকে উষ্ণ করে।

আমাদের মঞ্চের এই চারজন অশীতিপর যুবা কিন্তু সেই অল্প বয়সের বন্ধুই। এঁরা সামনের দিকে চেয়েই বাঁচেন,

রংবেরঙের সম্ভব-অসম্ভব স্বপ্ন লেগে আছে তাঁদের চোখে, তাঁদের দৃষ্টি সামনে ও পিছনে অনেক দূর অবধি বিস্তৃত, তাই তাঁরা এত স্পেশাল। জরার জড়তা ওঁদের স্পর্শ করতে পারেনি, নিত্যনতুন কাজের পরিকল্পনায় তাঁরা সযত্নে ব্যস্ত রাখেন নিজেদের। কী অক্লেশেই সময় ওঁদের চঞ্চলতার সঙ্গে আপনাকে মানিয়ে নিয়ে চলেছে।

কিন্তু এঁরা তো আলাদা প্রাণী। বিপরীতটাও মাঝে মাঝে মনে হয়। বয়স্কদের অভাবে কষ্ট পাই। বিজয়ার সময়ে মনে হয়, আমার বুঝি প্রণাম করার মানুষেরা কমতে কমতে ফুরিয়ে গিয়েছেন, মামা, কাকা, মাসি, পিসিরা হারিয়ে গিয়েছেন। মাস্টারমশাইয়েরাও নেই। তা হলে আমাকে আদর দেবে কে? প্রশ্রয় পাব কাদের কাছে? জীবনে আর গুরুজন বিশেষ কেউ নেই। এদিন ঈশ্বর চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, তা নয়। প্রকৃত অর্থেই প্রণম্য, এমন কিছু প্রিয় মানুষ এখনও আছেন আমাকে প্রশ্রয় দিতে, স্বতোৎসারিত আশীর্বাদের স্পর্শ দিয়ে আমার জীবন পুণ্য করে দিতে। মনে পড়ল, মঞ্চের চারজনের বাইরেও আছেন কিছু অমলিন স্নেহের উৎস। নব্বই পেরিয়েও অদ্যাপি তরুণ অমলাশংকর মাসিমা, সুকুমারীদি, মৃণালদা। পিছু পিছু আসছেন হাসিদি, টুকুপিসি, নীরেনদা, শানুদি, মহাশ্বেতাদিদি (তাঁরও জন্মদিন গেল ১৪, পৌষ সংক্রান্তিতে), আশাবরীবউদি, সোমেনদা, মমকাকিমা, দিদিভাই আর আসানসোলের মায়া-মা। কম নয়, এক ডজন প্লাস এক! সবাইকেই আমার জন্মদিনের প্রণাম। অনেক স্নেহ পেয়েছি, এখনও যেন পাই। ভাল থাকো তোমরা।

শঙ্খদা বললেন, 'আমারও ছোটবোনেরই সম্পর্ক নবনীতার সঙ্গে, কিন্তু সেটা আমার সঙ্গে সরাসরি নয়, আমার বাবা-মায়ের মাধ্যমে। আমার মা-বাবার শেষ বয়সে নবনীতা তাঁদের খুব কাছের মানুষ হয়ে গিয়েছিল, তাঁরা ওঁকে কন্যাস্নেহ করতেন। আমার মাঝে মাঝে ঈর্ষাই হয়ে যেত।' তারপরে এত সুন্দর একটি বাক্য বলেছেন যেটা আমি ভুলতেই পারছি না। হতে পারে ব্যাজস্তুতি, তবুও বলেছিলেন তো অনেক লোক সাক্ষী রেখে! শঙ্খদা বললেন, 'নবনীতার অনেক কিছুই সুন্দর, ও লেখে সুন্দর, ওকে দেখতে সুন্দর, ওর ব্যবহার সুন্দর (কথাগুলো ভুলভাল, বানানো-টানানো যাই হোক, শুনতে খুবই আহ্লাদের, কানে লেগে আছে!)' শেষে বললেন, 'কিন্তু ওর আর একটি জিনিসও খুব সুন্দর—ছদ্ম কলহ।' তারপরে একটা গল্প বললেন, তাঁর বাবার সঙ্গে আমার ছদ্ম কলহের গল্প।—'তখন নবনীতাকে প্রায়ই আন্তর্জাতিক সভা-সমিতিতে দেশের বাইরে যেতে হত, বাবা একবার ওকে লিখলেন, 'এত বাইরে বাইরে ঘোরো, পড়াও কখন?' এমনই ব্যাপার কাছাকাছি সময়ে আমাকেও বার কয়েক বিদেশে যেতে হয়েছিল। আমি একদিন সকালে বাবার ঘরে এসে দেখি একটি পোস্টকার্ড হাতে নিয়ে বাবা লজ্জা-লজ্জা মুখে বসে আছেন। কী ব্যাপার? বাবা পোস্টকার্ডটা আমাকে দিলেন। নবনীতা লিখেছেন, 'বাঃ, কেবল পরের মেয়ের দোষটাই দেখা হয়, নিজের ছেলের বেলায়?' বাবা হাসি হাসি মুখে বসে সেই ছদ্ম কলহটি উপভোগ করছিলেন।'

শঙ্খদার বাবা-মায়ের কাছে আমি সত্যি অনেক স্নেহ, অনেক প্রশ্রয় পেয়েছি। সেদিন সব কথা মনে পড়ে ভীষণ মনকেমন করে উঠল। বয়স আমাদের কখনও দূরে পাঠিয়ে দেয়, আবার কখনও কাছে টেনে আনে। দিন ফুরিয়ে এসেছে, বেশি সময় আর নেই—সেই সচেতনতা তো খুব কমজোরি নয়!

শঙ্খদার পরে বললেন বিজয়া মুখোপাধ্যায়, আমাদের সহপাঠী জীবনের বন্ধুতার কথা, সইয়ের কথা। চিন্ময় গুহ বললেন, 'এক মঞ্চে এতগুলো উজ্জ্বল মনীষার সমাবেশ, এ যে কতটা বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ঘটনা, তা ইতিহাস বুঝবে।' গোপা আদর করে বললেন আমার ব্রেবোর্নের বোকামির স্মৃতি, মাতৃয়ার্কির গল্প। বিশ্বজিৎ রায় খুব সুন্দর করে বললেন, আমার লেখার মধ্যে দিয়ে তিনি আমাকে কেমন চেনেন, বইতে পড়া নবনীতার গল্প। কাকলি চক্রবর্তী বললেন, তিনি আমাকে মূলত চেনেন তাঁর পিতা সন্তোষকুমার ঘোষ, এবং শ্বশুর নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর গভীর স্নেহধন্য একজন মানুষ বলেই। তারপরে আসল কথাটি জানালেন, তাঁর ছোট্ট নাতনিটিরও আমি নাকি বিশেষ প্রীতিধন্য, আমার রূপকথার মস্ত ভক্ত সে। সত্যি, এটা একটা বিরাট প্রাপ্তি! কন্যা-স্থানীয়ার নাতনিকে দলে পেয়েছি! এরাই তো হবে ভবিষ্যতের বন্ধু! যাদবপুরের আমার প্রথম বছরের ছাত্র দিলীপ চক্রবর্তী বললেন, আমাকে মাস্টারমশাই হিসেবে পাওয়ার মজা আর নতুন ধরনের অধ্যাপক আবিষ্কারের গল্প। একে তো বিভাগের প্রথম মহিলা অধ্যাপক। সে জ্ঞানের ভারে ভারী নয়, ছাত্রদের সঙ্গে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করে পড়া বুঝিয়ে দেয়, তুই-তোকারির সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলে। আমাদের সিরিয়াস বিভাগে এ ব্যাপার সেই প্রথম। কেয়াচৈতালি দাশগুপ্ত শোনালেন অন্য বিভাগের ছাত্রী হিসেবে তাঁদের চোখে আমার হুড়মুড়িয়ে গাড়ি চালানো নিয়ে মুগ্ধতার কাহিনি। তখনও তো মেয়ে-চালক বেশি দেখা যেত না। শুনে খুবই আহ্লাদিত হলুম। সেই ১৯৫৯-এর প্রথম লাইসেন্স। তারপর সমানেই গাড়ি চালিয়েছি এই সেদিন অবধি, যতদিন না চোখ ঘোরতর আপত্তি করল। সবাই আমার দ্রুতগতি নিয়ে কুমন্তব্য করলেও, সন্দীপন-ই শ্রেষ্ঠ মন্তব্য করেছিলেন—'চাকার সামনে বুক পেতে দিতে ইচ্ছে করে।' সবার শেষে বাগ্মী কবি কৃষ্ণা বসু. সই-হৃদয়ের কবোষ্ণতায়, গুছিয়ে, সুন্দরভাবে কিছু জরুরি কথা বললেন। অনুষ্ঠানের মাঝে মাঝে নবনীতার কবিতা আবৃত্তি করে শোনালেন সব্যসাচী আর সোমা। চমৎকার গান শোনালেন বিমল দে, রাজা ভট্টাচার্য। নিজেকে যথাসাধ্য আড়ালে রেখে সুষ্ঠুভাবে সভা সঞ্চালনা করলেন আয়োজক শুভাশিস চক্রবর্তী নিজেই। বাংলা অকাদেমির হল উপচে পড়া হাসিখুশি শ্রোতার ভিড়ের মধ্যে সেদিন আমার মেয়েরা তিনজনে ছিল, অনেক পুরনো ছাত্রছাত্রী ছিল, অনেক সই ছিল, আর অনেক পাঠক-পাঠিকা। শুধু মিডিয়া ছিল না।

সেদিন সব কিছুই আমার এত ভাল লেগেছে যে, বক্তাদের, আয়োজকদের ধন্যবাদ আর কী দেব? কথায় কতটুকু আর বলতে পারব? এমন সুন্দর জন্মদিনও মানুষের হয়? মারা যাওয়ার পরে সবাই ভাল ভাল কথা বলে জানি, তখন শত্রুও মিত্র হয়ে যায়। কিন্তু বেঁচে থাকতে এত আদর (তাও তো শতবর্ষ নয়!)? কপালে সইলে হয়।

আজ দক্ষিণের বারান্দায় হলুদ আর সাদা দু'রকমের গোলাপ ফুল ফুটেছে। হলুদ গাছটা ঋতুপর্ণার দেওয়া, ভদ্রেশ্বরের। আর সাদা ফুলের গাছটি ঘোষালবাড়ির, আড়িয়াদহের। আড়িয়াদহের লাল আর গোলাপিতেও কুঁড়ি ধরেছে। ওদের হলুদ গোলাপের চারাটি কেলটুশ লোভে পড়ে একটু খেয়ে ফেলেছে বটে, কিন্তু পুনরায় তিনি গজাচ্ছেন, ফুল ফোটাবেন নিশ্চয়ই।

পিকো ভয়ে ভয়ে বললে, জনামাসির কথায় নিজেই নিজের জন্মদিনের রিপোর্ট লিখবে, লোকে তোমাকে 'হামবড়া' ভাববে না তো মা? আমি বললুম, না, না, তা কেন ভাববে? সবাই তো জানে আমি নিজেকে কত 'হামছোটা' মনে করি। সেই জন্যই তো আমার জন্মদিনের কথা আমি না লিখলে কে লিখবে? সবচেয়ে আনন্দ তো আমারই হওয়ার কথা!

সত্যি এমন যে ভালবাসার কপাল করে এসেছিলুম, এত বছর না বাঁচলে তো সেটা জানতেও পারতুম না। বয়স হলে নাকি মানুষের বন্ধু থাকে না?

ঈশ্বর ভাল রাখুন আপনাদের সকলকে, যা পেয়েছি পঁচাত্তরে, তাই যেন পাই শেষে!

১৯.০১.২০১৩

nabaneetadevsen@gmail.com


সারপ্রাইজ কিংবা জন্মদিন?
সেরা উপহার এনে দিন।
Sreeleathers
বিশ্বের বৃহত্তম জুতো ও ব্যাগের স্টোর

 বৈশাখী ঘোষ

প্রাণের ’পরে চলে গেল কে

যদি ‘কাট’ বলতে তিরিশ সেকেন্ড দেরি করি, ও একটা কাণ্ড বাঁধিয়ে বসবে! সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন রবি ঘোষ সম্বন্ধে। এই ছোটখাটো মানুষটি কত বড় অভিনেতা ছিলেন, সে-প্রশ্ন তোলাই ধৃষ্টতা। বাঘা-বাঘা অভিনেতাকে ঘোল খাইয়ে দিয়েছেন স্রেফ অভিব্যক্তির বাহারে। আগামী কাল তাঁর মৃত্যুদিন—আজকের সূর্যচ্ছটায় ঝিলমিল হোক।

৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭ সাল। সেই অভিশপ্ত দিনটাকে ভুলতে চেষ্টা করেও পারি না। বিকেল তিনটে-সাড়ে তিনটের সময় যখন খবরটা কানে এল, কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন এক মুহূর্তের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বিনা মেঘে বজ্রপাত কথাটা শুনেছিলাম, কিন্তু সেটা যে আমার জীবনে এতটা সত্যি হয়ে দাঁড়াবে, কল্পনাও করতে পারিনি। জীবনটা থমকে গেল। এই ষোলো বছরেও যেন জীবনটা সেখানেই থমকে আছে। যে বাড়ি সবসময় হাসত, প্রাণের উচ্ছ্বাসে যে বাড়ি ভরপুর থাকত, সেই বাড়ি থেকে হাসি মুছে গেল, প্রাণের উচ্ছ্বাস চলে গেল। গতানুগতিক ভাবে জীবন চলতে থাকে। আসলে মানুষটাই যে ছিল প্রচণ্ড প্রাণবন্ত, জীবনীশক্তিতে ভরপুর! পুরো নাম ছিল রবীন্দ্রনাথ ঘোষদস্তিদার। বলতেন, ‘আমি মানুষটাও ছোটখাটো, তাই নামটাও কেটে ছোট করে নিয়েছি—রবি ঘোষ।’ বরিশালের গাভার ঘোষদস্তিদার পরিবারে জন্ম। মনোহরপুকুরের মুখার্জিবাড়ির ছেলে ডায়া মুখার্জি (ভাল নাম ছিল প্রণবেশ) ওঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু। ডায়াদার স্ত্রীর সঙ্গে আমার আগেই আলাপ ছিল। ওঁদের বাড়িতেই প্রথম দেখা হয়। আমার খুব কৌতূহল ছিল রবি ঘোষকে দেখব বলে। কিন্তু ওঁকে দেখামাত্রই আমি আর আমার দাদা অকারণে এমন হাসতে লাগলাম যে, যে কোনও লোক আমাদের দেখলে অভদ্র ছাড়া আর কিছু ভাববে না। কিন্তু ওঁর আমার এমন হাসি দেখেই পছন্দ হয়ে গেল। তারপর দু’তিনদিন ডায়াদের বাড়িতেই দেখাসোক্ষাৎ হয়। বিয়ে করবেন স্থির করলেন। দিন পনেরোর মধ্যে বিয়েও হয়ে গেল। তাও সকালবেলা বিয়ে হল। কারণ, বললেন যে ওঁর হাতে একদম সময় নেই। তখন বিজন থিয়েটারে ওঁর নাটক ‘শ্রীমতী ভয়ঙ্করী’ রমরমিয়ে চলছে। তাও থিয়েটারের ছেলেরা জোর করে চার-পাঁচদিনের ছুটি করিয়ে পুরীতে পাঠিয়ে দিল। ওখানে গিয়ে মানুষটাকে আরও ভাল করে চিনলাম।

সাধারণ লোক মনে করে যে, উনি বোধ হয় সারাক্ষণ হাসি, ঠাট্টা, মজা ইত্যাদি করতেন। কিন্তু এটা একেবারে ভুল ধারণা। উনি শান্ত, খুব গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। খুব বই পড়তে ভালবাসতেন। কোনও গল্প-উপন্যাস নয়। প্রবন্ধ টাইপের বই বা কোনও নাটকের ওপর লেখা বই পড়তেন। যখনই বাড়ি থাকতেন, বেশির ভাগ সময়ই বই নিয়ে সময় কাটাতেন। খুব সময় মানতেন। বাড়িতে যতই লোক আসুক না কেন, ১টার সময় ওঁর খাওয়ার টাইম ছিল। ঠিক ১টা অবধি-ই উনি তাদের সঙ্গে যা কথা বলার বলতেন, তারপর সোজা খাওয়ার ঘরে চলে যেতেন। স্টুডিও বা নাটক—সব জায়গাতেই উনি ঠিক সময়ের ১ ঘণ্টা আগে পৌঁছতেন। ড্রাইভার দেরি



বিয়ের পর। (বাঁ দিক থেকে) রবি ঘোষ, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, গোপালদা (বসে), ডায়া মুখোপাধ্যায় ও বৈশাখী ঘোষ

করে এলে ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে যেতেন। আবার এমনও হয়েছে যে, ড্রাইভারকে আগেই আনিয়ে তাকে খাইয়েদাইয়ে, শুইয়ে রেখে দিতেন যাতে দেরি না হয়। এতে যদি আমি খুব রাগারাগিও করতাম, কান দিতেন না।

কাজপাগল লোক বলতে যা বোঝায়, উনি ঠিক তাই ছিলেন। নিজের কাজের বাইরে কিছু জানতেন না। সংসারের সব আমার ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। এমনও হয়েছে তিন-চারজন বন্ধুকে খেতে বলেছেন, এদিকে আমাকে বলতে ভুলে গিয়েছেন। তারপর তারা সব ডিনার টাইম-এ এসে গেলে আমার কী নাজেহাল অবস্থা হত, বলার নয়। উনি কিন্তু নির্বিকার থাকতেন, যেন কিছুই হয়নি। পরে আমাকে শান্ত করার জন্য বলেছেন, 'জানো তো, আমার বাবাও এমন করতেন। দেশের কোনও লোকের সঙ্গে দেখা হলেই তাদের বাড়িতে দুপুরে খেতে নেমন্তন্ন করতেন। আর মাকে এসে কিছু বলতেন না। তারা এসে গেলে রান্নাঘরের দিকে মুখ বাড়িয়ে চিৎকার করে বলতেন চারজন লোক এসেছে, খাবে। মা দাঁত কিড়মিড় করতে করতে ওদের খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন।' আরও মজা করে বলতেন, 'আমরা বরিশালের কুলীন কায়স্থ তো, খুব উঁচু বংশ। আমাদের মাঝে মাঝে এসব করতে হয়।' কিছু একটা সংসারের কাজ করতে বললেই বলতেন, 'দ্যাখো, আমি উঁচু বংশ। এসব ছোটখাটো কাজ আমার দ্বারা হবে না।' বিয়ের পর পুরীতে বেড়াতে গিয়ে গাড়িতে করে সব জায়গা ঘুরছি। উদয়গিরি, খণ্ডগিরির সামনে এসে আমি গাড়ি দাঁড় করাতে বললে, বললেন যে, 'না, না, দাঁড়াতে হবে না। আমরা উঁচু বংশ। এত উঁচুতে উঠতে পারব না। বাড়িতে ইতিহাস বই আছে, গিয়ে পড়ে নিও।'

যখন অবসর থাকত, বাড়িতে বাইরের আর কোনও লোক নেই, আমিই একমাত্র শ্রোতা, তখন কত যে মজার মজার পরিবারের গল্প বলতেন যে বলার নয়। বিশেষ করে মা, বাবাকে নিয়ে। বলতেন, "আমরা ছোটবেলায় খুব কষ্ট করে মানুষ হয়েছি। বাবা আলিপুর জাজেস কোর্টে কাজ করতেন। মাসের পয়লা তারিখে মাইনে পেয়ে মাকে এনে দিতেন। ১৫ তারিখের মধ্যেই মা-র হাতে সব পয়সা শেষ হয়ে যেত। তখন মা একটা ছুতোনাতা করে বাবার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দিতেন। এক সপ্তাহ কথা বন্ধ থাকত। তারপর বাকি ক'টা দিন জোড়াতাপ্পি মেরে চলত। বলতেন, 'আমরা পাঁচ ভাইবোন এভাবেই মানুষ হয়েছি।' বাবা রিটায়ার করার পর আমাকে সেখানে চাকরিতে ঢোকানো হল। বাবা একটা কথাই বলে দিয়েছিলেন—'আর যাই করো, মনে রেখো জিতেন্দ্রনাথ ঘোষদস্তিদারের ছেলে তুমি। এই নামটা নষ্ট কোরো না।' সেইসময় কোর্টে খুব ঘুষ দেওয়ার চল ছিল। কিন্তু বাবা খুব সৎ-সজ্জন প্রকৃতির লোক ছিলেন বলে কোর্টে তাঁর খুব সুনাম ছিল। তাই তিনি তাঁর ছেলেকে 'ডিজঅনেস্ট' যেন কখনও না হয়, সেটা বলে রেখেছিলেন। ছেলে সেটা সারা জীবন মনে রেখেছিল।"

উনি খুব ঠাকুর-দেবতা মানা বা মন্দিরে যাওয়া এসব করতেন না। কিন্তু বাড়িতে কেউ যদি মানত, তাতে বাধা দিতেন না। পরীক্ষার সময় মা পকেটে ঠাকুরের ফুল ঢুকিয়ে দিতেন, বাধা দিতেন না। নিজে বাড়ি থেকে বেরনোর সময় মা, বাবার ফোটোতে প্রণাম করে বেরতেন। মা, বাবা-ই ছিল ওঁর ভগবান। রামকৃষ্ণ কথামৃত পড়তেন প্রায় সবসময়। প্রত্যেকটা কথায় কথামৃত থেকে উদ্ধৃতি দিতেন। আমাকে বিয়ের পর প্রথম উপহার দিয়েছিলেন কথামৃত।

মায়ের হাতের রান্নার প্রশংসা সবসময় করতেন। যতই ভাল করে রাঁধতাম, বলতেন মা-র মতো হয়নি। শীতকালে মা

বাড়িতে নানারকম পিঠে বানাতেন। আর বাবার নাকি জল খাওয়া সেইসময় বেড়ে যেত। থেকে থেকেই দিদিকে বলতেন, 'একগ্লাস জল দিবি।' দিদি জল আনলেই বলতেন 'শুধু জলটা খাব, একটা গোকুল পিঠে দে!' এদিকে বাবার ছিল গ্যাসট্রিকের ট্রাবল। ব্যস, তিন-চারটে পিঠে খাওয়ার পর থেকেই শুরু হয়ে যেত ব্যথা। উনি বলতেন, "আমি বাবার পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বলতাম—যদি বাবা আপনার এত কষ্ট হয়, তবে এরকম খান কেন?—ব্যস, বাবা রেগে গিয়ে বলতেন যে, 'কালই মডেলের মালিককে জেলে দেব।' মডেল হচ্ছে তেলের ঘানি, যেখান থেকে বাড়িতে তেল আসত।" এরকম পরিবার নিয়ে কত যে মজার মজার গল্প বলতেন, বলার নয়। বলতেন, 'ছোটবেলা থেকে বাবা, কাকার খাওয়া দেখে আমার খাওয়ার প্রতি আকর্ষণই কমে গিয়েছে।' ওঁর প্রিয় খাবার ছিল লুচি-মাংস। মুরগির মাংস নয়, খাসির মাংস। ব্লাড সুগার-এর রুগি ছিলেন, খুব কমই দেওয়া হত। মিষ্টি উনি ছুঁতেনই না। চায়ে চিনি কোনওদিনই খেতেন না। শীতকালে নতুন গুড়ের সন্দেশের ওপর একটু টান ছিল, তাও হয়তো আধখানা কখনও খেয়েছেন। খাওয়াদাওয়া ছিল খুবই সাধারণ এবং পরিমাণও খুব অল্প। নিয়মিত ব্যায়াম করতেন, গলফ খেলতেন। মর্নিং ওয়াক করতেন। শরীরের প্রতি যথেষ্ট যত্ন নিতেন। তবু কোথা থেকে কী যে হয়ে গেল! একটা সময় খুব বলতেন 'দেহপট মনে নট সকলি হারায়'। একমাত্র সান্ত্বনা এই কারণে যে, অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে না থেকে কাজ করতে করতে চলে গিয়েছেন।

ওঁর সম্বন্ধে লিখতে বসলে কত কী মনে পড়ে যায় যে, কোনটা ছেড়ে কোনটা লিখব বুঝতে পারি না। বাড়িতে মাঝে মাঝে বাইরের কেউ না থাকলে কাজের লোকদের, ড্রাইভার গণেশকে বসিয়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব, বিবেকানন্দ—এদের সম্বন্ধে সুন্দর সুন্দর গল্প এত সুন্দর করে বলতেন যে, সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনত। আমার মাকে নিজের মা ছাড়া কিছু ভাবতেন না। বলতেন, 'নিজের মা তো নেই, অন্তত এই মা-র জন্য কিছু করতে দাও।'

কর্মক্ষেত্রে খুব নিষ্ঠাবান ছিলেন। নিজের একমাত্র ছোট বোন হার্ট অ্যাটাকে একদিনের মধ্যে চলে গেল। রাতে খবর পেয়ে বোনকে নার্সিংহোমে ভর্তি করে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে সারারাত্রি প্রায় জেগে রইলেন। সকালবেলা বোন চলে গেল। দু'টোর সময় তাকে নিয়ে গেলে সেইদিনও তিনি থিয়েটার করতে গিয়েছিলেন। 'সারকারিনা' হল-এ তখন তার নাটক চলছিল। নাটক শেষ হওয়ার আগে পর্যন্ত কাউকে কিছু জানতে দেননি। পরে সবাই জেনে তো প্রচণ্ড অবাক। বলেছিলেন, 'আমার পার্সোনাল ক্ষতি হয়েছে বলে তো নাটকের ক্ষতি করতে পারব না। প্রোডিউসারের অনেক টাকা লোকসান হয়ে যাবে, সেটা তো হতে দিতে পারি না!' ছোটভাই মুম্বইতে থাকত, মেরিন ইঞ্জিনিয়র ছিল। এই একইভাবে হার্ট অ্যাটাকে চলে গেল। চিকিৎসার কোনও সুযোগ দেয়নি। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে নিয়ে সন্ধের প্লেনে মুম্বই চলে গেল। ছোটভাইয়ের ছেলে এল প্রায় মাঝরাতে আমেরিকা থেকে। সে এলে তাকে শান্ত করে, মাকে দেখতে বলে ভোরের প্লেন ধরে কলকাতা চলে এল। কারণ তার পরের দিন শুটিং ছিল। বললেন, 'আমার পার্সোনাল দুঃখ আমারই, তাতে কাজের ক্ষতি করব কেন?' এইরকমই ছিলেন মানুষটা। সারাজীবন পরের জন্য চিন্তা করে গিয়েছেন।

সত্যজিৎ রায় ও তাঁর স্ত্রী ছিলেন ওঁর অত্যন্ত শ্রদ্ধার মানুষ। অনেকবার আমাকে নিয়ে তাঁদের বাড়িতে গিয়েছেন। বউদি এখনও আমাকে খুব ভালবাসেন। অনেকদিন না গেলে খুব রাগ করেন। তাও এখন নানা কারণে আমার প্রায় যাওয়াই হয় না। যখন ওঁর মন কোনও কারণে খারাপ থাকত, বলতেন, 'ওখানে গিয়ে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বললেই মন ভাল হয়ে যেত।' ওঁদের বাড়ি ওঁর কাছে তীর্থক্ষেত্রের মতো ছিল। সন্দীপ, তার স্ত্রী ললিতা, পরবর্তী কালে তাদের ছেলে সৌরদীপ ওঁর খুব প্রিয় ছিল। এদেরকে খুব ভালবাসতেন। মানিকদার বাড়ি ছাড়াও আরেকটা জায়গা ওঁর খুব প্রিয় ছিল। সেটা ছিল ওয়াটারলু স্ট্রিট-এর ডা. বারজন রায়ের বাড়ি। বারিনদাকে নিজের ছোটভাই বলে সবসময় মনে করতেন। বারিনদার দাদা (ডা. গোপাল ব্যানার্জি) ছিলেন ওঁর নিজের দাদার মতন। আমাদের বিয়েতে বরকর্তাও ছিলেন গোপালদা-ই। বারিনদার ওখানে আমরা কত যে আড্ডা মেরেছি, খাওয়াদাওয়া করেছি, তার হিসাব নেই। বলতেন, 'ওটা আমার সেকেন্ড হোম।' উনি নেই, কিন্তু বারিনদা আর ওঁর স্ত্রী মঞ্জুলা আজও বিজয়ায় দেখা করতে আসেন, পয়লা বৈশাখের পর নিয়মিত আসেন তাঁদের দাদাকে শ্রদ্ধা জানাতে।

জুনিয়র শিল্পী, পরিচালক—এদের উনি খুব ভালবাসতেন। এদের কাজের খুব প্রশংসা করতেন। পরিচালক গৌতম ঘোষ, তার বন্ধু ও সহকারী শানু ব্যানার্জি—আরও অনেকের নাম এখন মনে পড়ছে না। এরা ওঁর খুব প্রিয়পাত্র ছিল। সৌমিত্রদা (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়) ওঁর বিশেষ বন্ধু ছিলেন। কোনও কারণে ছুটি থাকলে বাড়িতে সবাই মিলে খুব আড্ডা জমত। আরেকজনের কথা না বললেই নয়, তিনি ছিলেন শুভেন্দুদা

> একটা ভিন্ন স্বাদের ছবি করেছিলেন সত্যজিৎ রায়। সেই ছবিটির নাম 'জন অরণ্য'। এটা যে ডার্ক কমেডি-র পর্যায়ে পড়ে সেটা একমাত্র বিদেশের ক্রিটিকরাই বলেছিলেন। এই ছবিতে আমি অভিনয় করেছিলাম। আজ পর্যন্ত এটা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ছবি। হাসির মাধ্যমে যে একটা অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজের চেহারাকে দেখানো যায় সেটা মানিকদা দেখিয়েছেন। প্রথম দৃশ্যেই পরীক্ষার হলে শিক্ষক ঘুমোচ্ছেন—ছাত্ররা টুকছে। শিক্ষক তাকালেন এবং বললেন—'কি হচ্ছে ভাই।' জবাব এলো ছাত্রদের থেকে—'পরীক্ষা হচ্ছে।' এইখানে প্রচুর হাসি ওঠে দর্শকের মধ্যে—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা ভীতিরও সঞ্চার হয়। অর্থাৎ লেখাপড়ার হাল আমাদের কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। ছবিটা রিলিজ না-করতে দেবার জন্য তৎকালীন সরকার প্রচুর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পারেনি কারণ ছবিটা 'সত্যজিৎ রায়ের' বলে।
>
> ('বাংলা ছবিতে হাসি', 'ঋত্বিক স্মারক বক্তৃতা', সিনে ক্লাব অফ ক্যালকাটা ১৯৮৬)



একান্ত যাপন। মহিম হালদার স্ট্রিটের বাড়িতে

(শুভেন্দু চ্যাটার্জি)। পাশেই থাকতেন, খুব আড্ডা, গল্প হত। কখনও ওঁদের বাড়িতে, কখনও আমাদের বাড়িতে। কোথাও নিমন্ত্রণ থাকলে একসঙ্গেই সব যেতাম। শুভেন্দুদাকে খুব ভালবাসতেন। শুভেন্দুদার ছেলেরাও (অপু, দীপু) ওঁর খুব স্নেহের পাত্র ছিল। অপু অর্থাৎ শাশ্বত চ্যাটার্জিকে তো এখন প্রায় সবাই চেনেন। উনি বলতেন, 'দেখো, ও একদিন খুব নাম করবে।' সত্যিই তাই হয়েছে। ওকে যখন টিভিতে দেখি, খুব আনন্দ হয়। বাবুর (সন্দীপ রায়) শুটিং-এ আমাকে নিয়ে অনেকবার গিয়েছে। খুব আনন্দ, হইচই করেছি। একমাত্র ওদের শুটিং হলেই আমায় নিয়ে যেতেন। চলে যাওয়ার একমাস আগেও ওদের শুটিং-এ বোলপুরে (ফেলুদা) সবাই মিলে গিয়েছিলাম। খুব আনন্দ করেছিলাম।

নাটকের জগতে উৎপল দত্তকে গুরু বলে মানতেন। বলতেন, 'এই যে নাটক করছি, অভিনয় করছি, সবই ওঁর জন্য। নাট্যচর্চার হাতেখড়ি আমার ওঁরই কাছে।' আরও বলতেন, 'উৎপলদা আসলে নাট্যজগতের, অভিনয় জগতের পথিকৃত ছিলেন। ওঁর অভিনয়ের আদর্শ ছিলেন চার্লি চ্যাপলিন। চ্যাপলিন ছিলেন ওঁর প্রিয় কৌতুক অভিনেতা। যখনই সময় পেতেন ওঁর ছবি দেখতেন।'

লোকের ভালবাসা উনি প্রচুর পেয়েছেন। বলতেন, 'মহিম হালদার স্ট্রিটের এই ছোটখাটো চেহারার মানুষটা জীবনে এতখানি পাবে, কোনওদিন ভাবিনি। না চাইতেই এতখানি পাওয়া আমাকে ঋণী করেছে।' এক জায়গায় লিখেছেন— 'আপনাদের একান্ত প্রিয় 'রবি ঘোষ' হয়েই যেন এই জীবনটা শেষ করে দিতে পারি।' বাস্তবিক ক্ষেত্রে তাই-ই হয়েছে। আজ প্রায় ষোলো বছর হতে চলল, তাও সাধারণ মানুষের ভালবাসা এখনও তাঁর প্রতি তেমনই রয়েছে। তবে একটা দুঃখ মাঝে মাঝে হয় যে, আগে যে বাড়িতে সাধারণ মানুষের ভিড় লেগেই থাকত, আজ তাঁর জন্মদিনের অনুষ্ঠানে ('শতাব্দী ব্যালে ট্রুপ' করে) নিমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে শিল্পীদের সংখ্যা খুবই কম থাকে। জানি, তাঁরা খুব ব্যস্ত থাকেন, তা হলেও পাঁচ মিনিটও সময় তাঁরা দিতে পারেন না এই প্রিয় শিল্পীকে সম্মান জানাতে! তবু আমার দৃঢ় বিশ্বাস— মানুষ তাঁকে চিরদিন মনে রাখবে। আজ এত বছর হল উনি চলে গিয়েছেন, কিন্তু আমার সংসারের প্রতিটি লোক আমারই মতন ওঁকে এখনও ভীষণ মিস করে। প্রতিটি উৎসব- অনুষ্ঠানে, প্রতিটি কথায় ওঁর কথা একবার না একবার উঠবেই। প্রতিটি কাজের লোকের প্রয়োজনে উনি সারাক্ষণ থাকতেন। মানুষকে মানুষের মর্যাদা দেওয়া আমি ওঁর কাছ থেকেই শিখেছি। ওড়িশা থেকে একটা বাচ্চা ছেলে এসেছিল আমার বাড়িতে ওঁরই হাত ধরে। পয়সার অভাবে মাধ্যমিক শেষ করতে পারেনি। উনি এখানে অনেক ওড়িয়া মিডিয়াম খুঁজেছিলেন, কিন্তু পাননি। পরে অবশ্য আমিই ওকে বাংলা লেখাপড়া শিখিয়ে ওর পড়াশোনার ভার নিই। উনি খুব ভালবাসতেন ওকে। শেষ দিন বাড়ি থেকে বেরনোর সময় ওকে বলেছিলেন, 'চিনু, বউদি রইল, দেখিস।' ব্যস, সেই যে বেরলেন আর ফিরলেন না। চিনু আজও আমাকে তার দাদার মতো করেই দেখছে। আজ সে যুবক, অফিসে চাকরি করে। কিন্তু তার কর্তব্যে কোনও ফাঁকি নেই। শুধু আমাকে নয়, আমার সারা পরিবারকে ও দ্যাখে। কারও কোনও প্রয়োজন পড়লে ও সবসময় প্রাণ দিয়ে সাহায্য করে।

ভারতবর্ষের প্রায় অনেক জায়গাতেই আমাকে নিয়ে গিয়েছেন। ভারতবর্ষের বাইরে বিদেশেও অনেক জায়গাতে নিয়ে গিয়েছেন। যেমন, হংকং, ব্যাংকক, সিঙ্গাপুর, পাটায়া, লন্ডন, প্যারিস, আমেরিকারও অনেক জায়গাতে, কানাডাতে। আমার মতে, খুব কম মেয়েরই এমন সৌভাগ্য হয়, আমার যা হয়েছিল। আমার জীবনকে আনন্দে পরিপূর্ণ করে রেখেছিলেন। তাই আমার কোনও ক্ষোভ নেই। ভগবানের কাছে আমার কোনও নালিশ নেই। তিনি চলে গিয়েছেন, রেখে গিয়েছেন চিনুকে—যে একাধারে আমার পুত্র, আবার তার মধ্যে আমার স্বামীর প্রতিচ্ছায়া আমি দেখতে পাই। মনে হয় যেন ও সবসময় বলছে, 'আমি আছি, আমি চিনুর মধ্যে দিয়েই তোমার কাছে আছি।'—এই সান্ত্বনা নিয়েই বেঁচে আছি।

রবি ঘোষ ডা. বারীন রায়

এই ষাঁড়টা প্রতিক্রিয়াশীল !



ফুটপাতে শুয়ে থাকা নিরীহ বলীবর্দকে সপাটে লাথি হাঁকিয়ে রবিদা এ কথা বলেছিল। বলার ঢঙে ফুটে উঠেছিল উৎপল দত্তর সাহেবি উচ্চারণ। ষাঁড়টার একমাত্র অপরাধ : সে 'প্রতিক্রিয়াশীল' দলের নির্বাচনী প্রতীক! অতএব অবশ্যই 'ব্লাডি রিঅ্যাকশনারি'।

সালটা ১৯৯৮। তখন সবেমাত্র 'রবি ঘোষ স্মারক সংকলন' বইটা বেরিয়েছে। তাজ বেঙ্গলে ক্রিস্টাল রুমে একটা পার্টিতে বসন্তদা'র (চৌধুরী) সঙ্গে দেখা। আমাকে দেখেই বসন্তদা এগিয়ে এসে বলল (আমাদের মধ্যে 'তুমি' সম্বোধনটাই চলত দীর্ঘদিনের সম্পর্কে), তুমি না-পাঠালেও আমি দেখেছি। বুঝলুম কী প্রসঙ্গে কথাটা আসছে, তবু না-বোঝার ভান করে বললুম—কোনটার কথা বলছ? বসন্তদা বলল, তোমার করা 'রবি ঘোষ'। প্রত্যুত্তরে বলতেই হল, তোমায় কেন দেব? তোমাকে লিখতে বলেছিলুম, তুমি লেখনি। সে যাই হোক, তোমার কেমন লেগেছে?

—খুব একটা ভাল লাগেনি। আমি হলে ওর থেকে অর্ধেক লেখা ছেঁটে বাদ দিতুম।

বললুম—আমি হলে কী করতুম বলো তো?

—কী?

—যা করেছি, ওটা জেনে-বুঝেই করেছি। জানি, অনেক দামি বা মানী লোকের লেখার ভিড়ে রয়ে গিয়েছে আপাত-তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর কিছু মানুষের লেখা। ওগুলো দিয়েই তো আঁকতে চেয়েছি মানুষ রবি ঘোষের সম্পূর্ণ ছবিটা। আমার কাছে শিল্পী রবি ঘোষের থেকেও অনেক বড় মাপের ছিলেন মানুষ রবি ঘোষ। আর সে-কথা প্রথমেই কবুল করেছি 'রবি ঘোষ' সংকলনের 'নিবেদন'-এ :

'বাইরের মাপকাঠিতে সামাজিক মূল্যে লেখককে আমরা যাচাই করতে যাই নি। একথা আমাদের স্মরণে ছিল, সূর্যের কিরণ পাহাড়ের চূড়োয় আপন মহিমায় প্রতিফলিত হলেও ঘাসের ডগায় একটি ক্ষুদ্র শিশিরবিন্দুতেও তার পূর্ণরূপ বিম্বিত হয়। তাই যেখানেই তাঁর আলো বিচ্ছুরিত হতে দেখেছি, সাগ্রহে তুলে নিয়েছি। এই সংকলনে ঠাঁই পেয়েছে তাই, অতি পরিচিত বিদগ্ধ বিদ্বজ্জনের পাশাপাশি আপাত পরিচয়হীন সাধারণ মানুষের লেখাও।'

এই অতি মূল্যবান কাজটি করতে গিয়ে, রবি ঘোষের মূল দু'টি পরিচয়ের মধ্যে, উঁচু দরের এক শিল্পীকে অতিক্রম করে আমাদের কাছে ধরা পড়েছে বড় মাপের একজন মানুষ। দুই রবি-ই আমাদের জন্যে রেখে গিয়েছেন নির্মল এক হাসির উপহার। হাসির মোড়কে জীবনের সকল অসংগতিকে গ্রহণ করার ছবি ফুটে উঠেছে রবি ঘোষের জীবনে, আর সেই কথাই প্রতিফলিত হয়েছে রবি ঘোষ অভিনীত চরিত্রগুলোর নির্মাণে।

রবি ঘোষের কথা বলতে গেলে মনে পড়ে যায় আর এক রবির কথা—আমার আর এক রবিদা। তিনি রবি সেনগুপ্ত। কী রাজনীতি, কী শিল্প-সংস্কৃতি, কী আড্ডার আসরে, রবি

সেনগুপ্তকে চেনে না তখন এমন লোক বুঝি কলকাতায় বেশি ছিল না। যেমন শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত। একদিকে যেমন মৃণাল সেন, অন্যদিকে তেমনই মানিকবাবু অর্থাৎ সত্যজিৎ রায়। এই রবিদার কাজ বলতে মূল যেটা ছিল, তা হল, পরোপকার করে বেড়ানো। রবিদার পরিচিতির পরিধি ছিল বহুবিস্তৃত। কোনও একটা অভাবী দলকে সাহায্য করে যখনই দেখা গেল তারা সাফল্যের মুখ দেখতে পাচ্ছে, অমনি রবি সেন আর সেখানে নেই। ততদিনে তিনি খুঁজে নিয়েছেন অন্য কোনও উঠতি দলকে। এহেন রবি সেন (গুপ্ত) ছিলেন আমার বড়দা (মাসতুতো) স্বনামধন্য ডা. গোপাল ব্যানার্জির ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

তিন নম্বর ওয়াটার্লু স্ট্রিটে আমাদের বাড়িতে একটা আড্ডার ব্যাপার ছিল আমার মামার আমল থেকে। সেজমামা দন্তচিকিৎসক ডা. বঙ্কিম মুখার্জি স্বনামধন্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ—ডাক্তার, রাজনীতিবিদ, সিনেমা-থিয়েটারের অভিনেতা, সাহিত্যিক, গায়ক—সবাই—তাঁর সঙ্গে বসে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা আড্ডা দিতেন। মামার পরে, আমার মাসতুতো দাদা ডা. গোপাল ব্যানার্জির বদান্যতায় পুরোদস্তুর বজায় ছিল এই আড্ডা। মামার মতোই গোপালদার নাম-ডাক ছিল কলকাতায়। অত্যন্ত মিশুকে, উদার, খোলা মনের মেজাজি মানুষ ছিলেন গোপালদাও।



শিল্পী বিকাশ ভট্টাচার্য

তখন চেম্বারে সকালের রুগি-দেখা-পর্ব শেষ হত বেলা বারোটায়। দুপুরের খাওয়াদাওয়া কখনওই একটা-দেড়টার আগে হত না। বারোটা থেকে একটা-দেড়টা, এই সময়টুকুতে গোপালদার ঘরে একটা মিনি আড্ডা বসত। গোপালদার বন্ধুবান্ধবরা, বিশেষ করে এই ডালহৌসি পাড়ায় যাঁদের অফিস ছিল, তাঁদের অনেকেই আসতেন এই দুপুরের আড্ডায়। প্রায় নিয়মিত যাঁরা আসতেন, তাঁদের একজন ছিলেন রবি সেনগুপ্ত।

সকালে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ-এর কফি হাউসের আড্ডায় হাজিরা দিয়ে, তারপর সেখানে থেকে রবিদা আসতেন গোপালদার কাছে। রবীন্দ্রনাথের গানের কোনও একটা কলি গুনগুন করে গাইতে-গাইতে ঘরে ঢুকতেন। অনেক সময় কোনও শাগরেদ বা বন্ধুকে নিয়ে আসতেন, গোপালদার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতেন। এই পরিচয় পরে পারিবারিক বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছে বহু ক্ষেত্রে। রবি ঘোষের সঙ্গে গোপালদার বা আমার ঘনিষ্ঠতার ইতিহাসটাও এই আড্ডার সূত্রেই।

গোপালদার আড্ডায় রবি ঘোষ প্রথম যেদিন এসে হাজির হলেন, সেই দিনটার কথা আজও স্পষ্ট মনে আছে। সকালের কাজ শেষ। আমরা সবাই গোপালদার ঘরে। গোপালদা নিজস্ব আয়েসি ভঙ্গিতে ইজিচেয়ারে আসীন। পাশের টেবিলে বিয়ারের গ্লাস। বিয়ারের বোতলটা নীচে মাটিতে রাখা। ঘরের দরজা ঠেলে ঢুকলেন রবি সেনগুপ্ত। সঙ্গে আর একজন। রবিদা আলাপ করিয়ে দিলেন গোপালদার সঙ্গে—"এই যে 'মাল'-কে নিয়ে এসেছি। চিনতে পারছ?" না-চেনার কিছু নেই। কারণ মিনার্ভা-য় এলটিজি-র 'অঙ্গার' এবং তার আগে 'ছায়ানট' আমাদের দেখা ছিল। এই দু'টি নাটকে রবি ঘোষের অভিনয় ভুলে যাওয়া একরকম অসম্ভব। গোপালদা ইজিচেয়ারে বসে-বসেই আতিশয্যবিহীন উষ্ণতায় অভ্যর্থনা জানিয়ে সামনের মোড়াটা দেখিয়ে রবি ঘোষকে বসতে বললেন। তারপর সহজ, গম্ভীর অথচ সরস ভঙ্গিমায় বিয়ারের গ্লাসটার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে রবি ঘোষের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী মাস্টার—এসব চলে না কি? হবে একটু?' রবি ঘোষ সম্ভবত প্রথম সাক্ষাতেই ঠিক এতটা আশা করেননি। তবু সহজ সপ্রতিভতায় একবার রবি সেনগুপ্তর দিকে এক ঝলক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে আমতা-আমতা করে উত্তর দিলেন—'তা, দিলে

খাব'। গোপালদার এই ধরনের আপ্যায়নে অভ্যস্ত রবি সেনগুপ্তদার বিশেষ কোনও প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা গেল না। এরপর গ্লাস এল দুই রবির জন্যেই। সেদিন যথারীতি আমাদের খাওয়াদাওয়া সারতে একটু দেরিই হল। প্রথম দিনেই রবি ঘোষ কথায়-বার্তায়, গল্পে-হাসিতে একেবারে জমিয়ে দিয়ে গেলেন। এবং এই প্রথম সাক্ষাতেই গোপালদাকে 'দাদা' তো বটেই, একজন 'গুরুলোক' বলেও যে মেনে নিয়েছিলেন মনে-মনে, সে-কথা ওঁর মুখে পরে শুনেছি।

এরপর থেকে যা হয়, রবিদা, মানে রবি ঘোষ, গোপালদার আড্ডার একজন 'রেগুলার মেম্বার' হয়ে গেল (লেখার এই পর্ব থেকে 'তুমি'-'তুমি' করেই সম্বোধন করব মানুষটাকে)। তখন আর রবি সেনগুপ্তর সঙ্গে আসার জন্য অপেক্ষা নয়। খবর দিয়ে, না-দিয়ে দুপুরে-সন্ধেয় যখন-তখন রবিদার আনাগোনা শুরু হয়ে গেল। গোপালদাও রবিদাকে এখানে-ওখানে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে, সংস্কারমুক্ত মনে সব কিছুকে সহজ করে দেখার, গ্রহণ করার নিজস্ব জীবনদর্শনে তালিম দিতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে রবিদার খ্যাতি দিন-দিন বেড়েই চলেছে। বিয়ে করেছে অনুভাদিকে। অনেক সময়েই অনুভাদিকে সঙ্গে নিয়ে আসে আমাদের বাড়িতে। অবশ্য বিয়ের আগেও বহুবার অনুভাদি এসেছেন রবিদার সঙ্গে। রবিদা এলেই আড্ডার চেহারাটা পালটে যায়। রবিদার ঝুলি থেকে বেরিয়ে আসতে থাকে অফুরন্ত হাসির জোগান। একই গল্প বারবার শুনতে চাইতুম আমরা। কারণ রবিদা এত বড় শিল্পী ছিল—একই পুরনো গল্প রবিদার পরিবেশনের ধরনে প্রতিবার যেন নতুন লাগত। অনেকের গল্প, অনেকের কথাই বলত রবিদা। মাঝে-মাঝে কমলদা'র কথা বলত। কমলকুমার মজুমদারের বৈদগ্ধ্য কলকাতার বিদ্বজ্জন মহলে সুবিদিত ছিল। কমলদাকে রবিদা অসম্ভব শ্রদ্ধা করত। কমলদাও ভালবাসতেন রবিদাকে। কমলদা ছিলেন কালী-ভক্ত। খুব মানতেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব-কে। কমলদার ব্যাপারে কটাক্ষ করে কেউ যদি জিগ্যেস করত, 'আচ্ছা রবি, তোমার সঙ্গে কমল মজুমদারের পটে কী করে? ওই আড্ডায় তুমি কী করো?' রবিদার চটজলদি উত্তর : 'কেন ভাই, পণ্ডিতে-পণ্ডিতে ঝামেলা হতে পারে, কিন্তু আমার বেলায় সে-বালাই নেই! কমলদা মহাপণ্ডিত আর আমি মহামূর্খ। কাজেই অসুবিধের কী আছে?'

এর কিছুদিন পরে, ভোর চারটের সময় আমাদের ফোনটা বেজে উঠল। আমার ভাই অচিন ফোনটা ধরে আমাকে এসে ডাকল—ওঠ, এখুনি বেরতে হবে। রবিদার বাড়ি থেকে ফোন এসেছিল—অনুভা-বউদি আর নেই।

—সে কী! এরকম একটা আচমকা খবরে ধড়মড় করে উঠে বসলুম।

যদুবাবুর বাজার থেকে ফুল কিনে নিয়ে অচিনকে বললুম, আগেই ফুলটা নিয়ে যাসনি। কে জানে, ঘুম চোখে কী শুনতে কী শুনেছিস। আগে গিয়ে দেখি, যদি সত্যি হয়—তখন ফুলটা নিয়ে এলেই হবে গাড়ি থেকে। রবিদার বাড়ি পৌঁছে দেখলুম, অনুভাদিকে শোয়ানো হয়েছে ঘরের মাঝখানে। ইতিমধ্যে পৌঁছে গিয়েছে কিছু আত্মীয়স্বজন আর রবিদার কয়েকজন বন্ধু। কেউ কোনও কথা বলছে না। রবিদা একধারে বসে। দু'হাত দিয়ে চাদরে মুখটা ঢেকে রেখেছে। কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে না, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, থেকে-থেকেই ডুকরে উঠছে। সহজেই অনুমান হয় দাঁতে দাঁত চেপে কান্নার আবেগটাকে ধরার চেষ্টা করছে প্রাণপণে। সেই একবারই রবিদাকে যথার্থ কাঁদতে দেখেছিলুম। এরপর বছর না-ঘুরতেই একে-একে চলে গেলেন রবিদার দিদি, তারপর মা।

দীর্ঘদিন রবিদার সঙ্গে ওঠা-বসা করে যা বুঝেছি, তা হল রবিদা ছিল একজন খাঁটি মানুষ। কোনও প্রিটেনশন বা ভণ্ডামির ধার ধারত না। মাথা উঁচু করে সোজাসুজি চলত, সোজাসুজি বলত। এর পরিচয় পরে রবিদার সমস্ত লেখার মধ্যে পেয়েছি। অপরের মধ্যেও এই ভণ্ডামি জিনিসটা রবিদাকে পীড়া দিত। তবে নিজের মতামত নিয়ে অপরের সঙ্গে সচরাচর তর্কে প্রবৃত্ত হত না। নির্মল হাসি দিয়ে ম্যানেজ করে অন্য প্রসঙ্গে চলে যেত। এই নিয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা যদি পরে কটাক্ষ করে বলত, 'এই ব্যাপারটায় তোমার কিন্তু বলা উচিত ছিল কিছু। একটা অন্তত প্রতিবাদের দরকার ছিল।' রবিদার সাফ উত্তর ছিল, 'যাক গে, ছেড়ে দে না। যে যা ভাবে ভাবুক না। কী এসে-যায় তাতে?' আরও একটি দিক রবিদার চরিত্রের অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। সেটি হল—সকলের সঙ্গে চুটিয়ে আড্ডা দিলেও পরচর্চা বা পরনিন্দা রবিদার মুখে কখনওই শোনা যেত না।

নিজের স্বভাবগত প্রকৃতির মধ্যেই একটি জীবন-জিজ্ঞাসা রবিদার জীবনবোধকে পুষ্ট করেছিল বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে। সমসাময়িক কালের বিশ্বজোড়া প্রগতিপন্থী হাওয়ায় একজন সচেতন উদ্বুদ্ধ মানুষ হিসেবে স্বাভাবিক ভাবে সাম্যবাদের স্বপ্ন এবং আদর্শে অনুপ্রাণিত হলেও, রবিদা ডগ্‌মা-কে আশ্রয় করেনি, কোনও দিন গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেয়নি। যে-সমাজের মধ্যে বাস করেছে সেই সমাজকে, নিজের চারপাশের মানুষগুলোকে দেখতে চাইত নিজের চোখ-কান খোলা রেখে। খোলা মনে। নাকের ওপর কোনও তাত্ত্বিক ইজমের চশমা এঁটে নয়। তাই মানবিক মূল্যবোধে আস্থা বা শ্রদ্ধা না-হারিয়েও মানুষের চারিত্রিক স্খলন, মানুষের মধ্যে একাধারে আদর্শ, ন্যায়-নীতি ও ব্যক্তিগত দুর্বলতার সহাবস্থান দেখে মজা পেত যেমন, তেমনই বেদনাও পেত। এখান থেকেই উঠে আসত রবিদার হাসি—ব্যক্তি রবির এবং অভিনেতা রবি ঘোষের।

রবিদার মধ্যে যে-জিনিসটা ছিল, তা হল মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ এবং ভালবাসা—যা না-থাকলে মানুষের দুর্বলতা নিয়ে হয়তো ঠাট্টা করা যায়, কিন্তু হিউমার বা স্যাটায়ার সৃষ্টি করা যায় না। রবিদার অভিনীত বেশির ভাগ চরিত্রগুলো এই কারণেই পেয়েছে অন্য মাত্রা। আপন প্রকৃতির মধ্যেই বৈপরীত্য-ভরা যে-মানুষ, পারিপার্শ্বিকতাকে অতিক্রম করার ব্যর্থতায় মানুষের যে-অসহায়তা, আপাত সারল্যের অন্তরালে মানসিক দ্বন্দ্বের যে-আলোছায়া—সেসবই রবিদার সংবেদনশীল অভিনয়কে এক বিচিত্র বৈভব দান করেছে। এককথায় চরিত্রগুলো বিশ্বাসযোগ্যতায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। হয়ে উঠেছে আমাদের চেনা মানুষ।

রবিদা ভালবাসতে জানত, তাই অমন রাশভারী বাবাকে নিয়েও যেমন হাসতে পারত, তেমনই অবস্থার চাপে অসহায়, নিরীহ, সরল ভালমানুষ মা-র নানা গল্প মজা করে বলে, পারত নিজে হাসতে, আমাদের হাসাতে।

উৎপল দত্তকে গুরুর আসনে বসিয়ে আমরণ শ্রদ্ধা করলেও উৎপলদার ছেলেমানুষি রবিদার চোখ এড়াত না। উদ্দীপ্ত আলোচনার পর কফি হাউস থেকে বেরিয়েই ফুটপাতে শুয়ে-থাকা নিরীহ একটি ষাঁড়কে উৎপলদার সেই সময়কার সাহেবি মেজাজে 'ব্লাডি রিঅ্যাকশনারি' বলে বীরদর্পে লাথি মারার (ষাঁড়টার অপরাধ : সে 'প্রতিক্রিয়াশীল' দলের নির্বাচনী প্রতীক) দৃশ্যের বর্ণনা দিয়ে অনাবিল হাসির উদ্রেক ঘটিয়েছে বারবার।

যে-কথাটা বলতে চাই, শিল্পে-সাহিত্যে যাঁরা হাসির কারবারি তাঁরা কেউই হালকা চরিত্রের মানুষ ছিলেন না। যেমন চার্লি চ্যাপলিন। বাংলা সাহিত্যে 'কমলাকান্ত'-র স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, পরশুরাম অর্থাৎ রাজশেখর বসু, 'আবোল তাবোল'-খ্যাত সুকুমার রায়, আরও অনেক নাম করা যেতে পারে। এঁরা সবাই ব্যক্তিগত জীবনে সিরিয়াস মানুষ—গভীর সঞ্চারী।

রবিদাও ছিল সত্যিকারের একজন সিরিয়াস মানুষ। একের-পর-এক প্রিয়জনের মৃত্যুজনিত শোক রবিদার জীবনবোধকে নিয়ে গিয়েছে গভীর থেকে গভীরতর স্তরে। শোকবিহ্বল হতে রবিদাকে কেউ কখনও দেখেনি। শোকে, দুঃখে, আনন্দে, বিষাদে রবিদাকে বাইরে থেকে আলাদা করে বড় একটা বোঝা যেত না বিশেষ। দেখে-দেখে আমি শুধু অবাক হয়ে ভাবতুম,

রবিদা এত মানসিক শক্তি পায় কোথা থেকে? কোথাও এক গভীর বিশ্বাস না-থাকলে কি মানুষ পারে প্রতিকূলতার মধ্যে এই ধৈর্য এই স্থৈর্য রক্ষা করে চলতে? আমাদেরই মধ্যে আমাদেরই মতন হয়ে থাকত রবিদা। জীবনের সকল অসামঞ্জস্যকে হাসির মোড়কে গ্রহণ করার এবং সেই রস বিতরণ করার অদ্ভুত এক জাদু জানা ছিল রবিদার।

নিজের বিশ্বাসকে অপরের ওপর চাপিয়ে দেওয়া ছিল রবিদার স্বভাববিরুদ্ধ। অপরের বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করতে, সম্মান দিতে কুণ্ঠা ছিল না কখনও। ঠাকুরের প্রসাদ বলে কেউ কিছু দিলে হাত পেতে নিত। ব্যস, ওই পর্যন্তই। বউদির মুখে শুনেছি, পুরী যেতে রবিদা খুবই ভালবাসত। আকর্ষণটা ছিল সমুদ্রের। ভুলেও কোনও দিন জগন্নাথের মন্দিরে যেত না, কিন্তু বউদিকে সব সময়েই বলত, 'তুমি যাও ঘুরে এসো'। সব ব্যবস্থা করে দিত নিজে।

সব মানুষের মধ্যেই একই সঙ্গে অনেকগুলো মানুষ বাস করে সত্য, তবে সকলের মধ্যেই কিন্তু এত বৈপরীত্যের সহাবস্থান দেখা যায় না সচরাচর, যেমন দেখা যেত রবিদার মধ্যে। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর কমলদা (মজুমদার) 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-র খণ্ডগুলো রবিদাকে দিয়ে বলেছিলেন—'সময় পেলে ওই বইগুলো পড়ো'—মনে শান্তি পাবে। অনুভাদি'র মৃত্যুর অনেক বছর পরে বৈশাখী বউদিকে বিয়ে করে এনে প্রথম উপহার হিসেবে রবিদা দিয়েছিল 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত'। বলেছিল, 'এগুলো অবসর সময়ে পড়লে শান্তি পাবে মনে।' এই প্রসঙ্গে একদিন বৈশাখী বউদির সঙ্গে কথা হচ্ছিল। বউদি বলল, দ্যাখো 'ও' দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু প্রথম-প্রথম আমি খুব একটা পড়তাম না দেখে বলত, "কীসব আজে-বাজে কথা বলে আর আজে-বাজে সিনেমা দেখে সময় নষ্ট করো, ততক্ষণ 'কথামৃত' পড়লে দেখবে ভাল লাগবে, মনে শান্তি পাবে।" বউদি বলে চলে, "একটা সময় তখন ওষুধ খেয়েও কাজ হয় না, একদিন হঠাৎই আমি যেন 'ও'-র সেই কথাগুলো শুনতে পেলুম মনে মনে। তারপর বইগুলো পড়তে আরম্ভ করে যখন মনের মধ্যে সত্যিই শান্তি পাচ্ছি, তখন ভেবেছি, 'ও' নিশ্চয়ই কথামৃত পড়ে শান্তি পেত, আর তাই আমাকে পড়ার জন্য বলেছিল বারবার।"

বৈশাখী বউদি আর একদিন বলছিল : তোমাদের দাদা আমাকে অনেক সময় বলত, 'কী হবে মন্দিরে গিয়ে, আর বসে-বসে ঠাকুর পুজো করে, বরং তোমার চারপাশে যারা আছে, সেই মানুষগুলোকে দেখবে তা হলেই তোমার ঈশ্বরের পুজো করা হবে।' ছেলেরা পুজোর চাঁদা চাইতে এলেও দিত না। বলত, 'ফুটবল কিনে দিচ্ছি খেলো গে যাও।' কিংবা বলত, 'টাকা দিচ্ছি লাইব্রেরির জন্য বই কেনো'—এ না-হয় বোঝা যায় প্রথম জীবনে কমিউনিজমে দীক্ষিত এবং পরবর্তী কালে বিবেকানন্দ পড়া একজন মানুষের কথা, কিন্তু 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' পাঠ করে কোন শান্তি খুঁজে পেয়েছিল রবিদা, যে বৈশাখীকে বিয়ে করার পরে তাকেও সেই শান্তির সন্ধান নিতে প্রেরণা দিয়েছিল? বারবার আমি ভেবেছি, তবে কি রবিদা নিজের মনের গভীরে সত্যি-সত্যিই ঈশ্বরে বিশ্বাস করে?

তখন প্রশ্ন উঠেছে আমারই মনে, বিশ্বাস যদি করেই তবে নিজের সেই বিশ্বাসের কথা অপরের কাছে প্রকাশ করায় এত কুণ্ঠা কেন? এ কি লোকলজ্জা? একদিন সাম্যবাদের জয়গানে নিরীশ্বরবাদীদের সঙ্গে ওঠাবসা ছিল, আজ তাই লোকসমক্ষে অন্য কোনও বিশ্বাসের কথা বলতে সংকোচ? অথচ আগেই বলেছি, রবিদার মধ্যে তো ছিল না কোনওরকমের ভণ্ডামি। মনে এক, মুখে আরেক—এ তো ভণ্ডামিরই নামান্তর! নিজের



প্রথমা স্ত্রী অনুভা গুপ্তের সঙ্গে

মনেই সন্ধান করি এসবের উত্তর। দেখতে পাই, 'ঈশ্বর আছেন'-এর সপক্ষে বা বিপক্ষে কোনও কথাই কিন্তু রবিদাকে কবুল করতে শুনিনি আমরা। 'কথামৃত' পড়ার প্রসঙ্গ অনেকবারই শুনেছি। কিন্তু সেখান থেকে অন্য কোনও উদ্ধৃতি দিতে কখনও শুনিনি একটি ছাড়া—'আমাকে রসেবশে রাখিস মা'—তা-ও অনেকটা কৌতুকের ভঙ্গিতে।

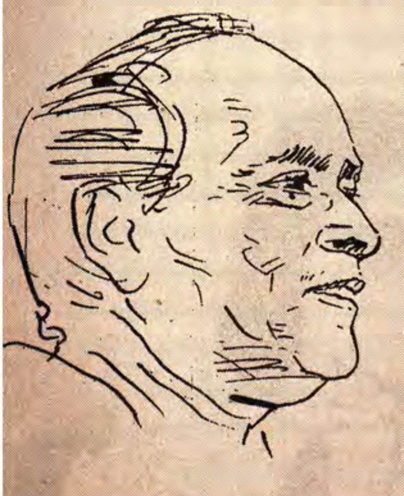
পিতা-মাতার বিশ্বাসের দোহাই দিয়ে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান মেনে মা-বাবার শ্রাদ্ধ করতে অনেককেই দেখা যায়; কিন্তু রবিদার ক্ষেত্রে যখন দেখি, শুধু পিতৃ-মাতৃশ্রাদ্ধ নয়, প্রথমা স্ত্রী অনুভার মৃত্যুর পর পূর্ণমর্যাদায় শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করতে—তখন রবিদার বিশ্বাস-অবিশ্বাস নিয়ে আমাদের প্রশ্নটা থেকেই যায়।

রবিদা বৈশাখী বউদিকে বিয়ে করেছিল পরিণত বয়সে। বিয়ে করেছিল অগ্নিসাক্ষী করে, বরের বেশে পুরোহিতদের পড়ানো মন্ত্র বলে। এ-ও কি শুধুই অপরের বিশ্বাসকে সম্মান দেওয়ার জন্য? আর এত বছর ধরে বারবার, ফিরে-ফিরে আমার কাছে যে-প্রশ্ন করেছে সময় এবং সুযোগ হলেই—সবই কি ভাগ্য? পূর্বনির্দিষ্ট? মানুষের হাতে কি কিছুই নেই? সবই কি কোনও এক অদৃশ্য প্রদেশ থেকে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে—এরই বা ব্যাখ্যা কী?

বউদির মুখে শুনেছি, রবিদা খুব একটা পছন্দ করত না যে বউদি পুজোআচ্চা করুক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘরে লক্ষ্মীর ঘট পেতে বউদি যেদিন শাঁখ বাজিয়েছিল, সেই শঙ্খধ্বনি রবিদাকে ছেলেবেলার কোন নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত করেছিল! তারই প্রতিধ্বনি রবিদা কি শুনেছিল প্রাণের গভীরে—যেখানে সে একা, সম্পূর্ণ একাকী? যে-নিভৃতিতে চিরবিরাজিত রবিদার প্রাণের দেবতা? সেই পরম ভালবাসার 'ধন'-কে কি সবার সঙ্গে হাটের মাঝে ঠিক তেমনটি করে পাওয়া যায়?

শঙ্খ ঘোষ

একজন ভূতপূর্ব লোক



মুখের সামান্য ভাঁজে, পেশির ঈষৎ সঞ্চালনে, চোখের তারা বা ভুরুর ক্ষিপ্র উত্থানপতনে, দৃষ্টিকে অনায়াসে উজ্জ্বলতা বা নিষ্প্রভতায় নিয়ে গিয়ে কৌতুকাভিনয়ে এক দুরন্ত আভিজাত্য নিয়ে আসতেন রবি ঘোষ। এই আভিজাত্যেই তিনি অন্যদের থেকে আলাদা।

সঙ্গের স্কেচ-টি শিল্পী সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়ের

কোনো ফিল্মে নয়, কোনো কৌতুকের অভিনয়ে নয়, সাঁইত্রিশ বছর আগে রবি ঘোষের শিল্পীপরিচয় প্রথম আমরা পেয়েছিলাম মঞ্চের উপরে, 'অঙ্গার' নাটকে। বন্ধুরা কয়েকজন মিলে দেখতে গিয়েছি 'অঙ্গার'। প্রধান আকর্ষণ উৎপল দত্ত, লিট্‌ল থিয়েটার। না, সেই সঙ্গে কিছুটা হয়তো তাপস সেনও। কেননা শুরু থেকেই রটে গিয়েছে যে আলোর কৌশলে তাপস সেন নাকি খনির ভিতরে জল ঢুকবার ভয়াবহ এক দৃশ্য একেবারে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন। কিন্তু শেষ সেই জাদুদৃশ্যে পৌঁছবার অনেক আগেই, পুরো নাটকের কাহিনিগত অভিঘাতটা পৌঁছবার অনেক আগেই, এর অন্যতম চরিত্র হিসেবে অপরিচিত ছোটখাটো একজন মানুষ যখন এসে বলে ওঠেন 'আমি একজন ভূতপূর্ব লোক', মুগ্ধ হয়ে যাই আমরা। সনাতনের ভূমিকায় ওই কথা ক'টি তখন বলেছিলেন নতুন একজন অভিনেতা, রবি ঘোষ। যে-বন্ধুর সঙ্গে দেখেছিলাম সেই নাটক, এই সাঁইত্রিশ বছর জুড়ে যে-কোনো সময়ে সে-অভিনেতার প্রসঙ্গ উঠলেই অবধারিত আজও সে বলবে একবার : 'আমি একজন ভূতপূর্ব লোক।'

কী যে ছিল সেই উচ্চারণে, কেন যে এমনভাবে আমাদের ধরে ফেলল সেটা, পরে অনেক সময়ে তা ভাবতে চেষ্টা করেছি। খাদের মধ্যে সাতদিন আটকে পড়েছিল একজন, কোনোরকমে পরে বেরিয়ে এসে সে দেখে কোম্পানি নিজের দায় থেকে মুক্ত হবার জন্য জানিয়ে দিয়েছে সে-মানুষের কোনো অস্তিত্বই ছিল না কখনো। কিছুদিন নিজেকে নিজে বলে প্রমাণ করবার ব্যর্থ চেষ্টার পর নতুন নাম নিয়ে নতুন কোলিয়ারিতে কাজ নিয়েছে সে, আর এখন 'আমার নিজেরই ঠিক থাকে না আমি কে।' অন্য শ্রমিকেরা সে-কথা শুনে হাসে, সে হাসে না।

ওই সাধারণ একটা পরিচয় উচ্চারণ করবার মধ্যে রবি ঘোষ তাঁর স্বরে এতরকম অনুভবকে একসঙ্গে ধরতে পেরেছিলেন সেদিন যে বিস্মিত না হয়ে আমাদের উপায় ছিল না। ভাগ্যকে পরিহাস, নিজেকে পরিহাস, কর্তৃপক্ষকে পরিহাস, আর তার সঙ্গে যেমন করে হোক বেঁচে থাকবার একটা স্বাভাবিক মরিয়া আবেগ, সমস্ত মিলে গিয়ে একটা ঘনতাময় অথচ স্বচ্ছন্দ প্রকাশভঙ্গি তৈরি হয়েছিল তাঁর মুখে। সেই ভঙ্গি ব্যাকুল তীব্রতায় পৌঁছয় একেবারে শেষ দৃশ্যে। জল একটু একটু করে বাড়ছে আবদ্ধ খনির মধ্যে, নিশ্চিত মৃত্যু জেনে আটকে পড়া শ্রমিকেরা ছোট ছোট চিরকুট লিখে রাখছে তাদের বেঁচে থাকবার শেষ দলিল হিসেবে, জলের উপরে সেই চিরকুটধরা হাত তুলে লাফিয়ে উঠবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে সনাতন বলছে : 'পৃথিবীর মানুষ, তোমরা আমাদের ভুলো না', আর জল উঠে যাচ্ছে তাদের মাথার উপরে।

সেই থেকেই আমরা আর ভুলিনি রবি ঘোষকে, সেই 'অঙ্গার' থেকেই আমরা রবি ঘোষের ভক্ত।

যে-কোনো কারণেই হোক, মঞ্চ তাঁকে ছাড়তে হল এরপরেই। খবরটা জেনে আমাদের তখন মনে হয়েছিল মস্ত একটা ক্ষতি ঘটে গেল। ক্ষতির এই বোধটা বেশিদিন আর থাকেনি অবশ্য।



নক্ষত্র সমাবেশ কিংবা ঐতিহাসিক দলিল। 'অঙ্গার' নাটকের অভিনয় সমাপ্তির পর

এরপর তিরিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে হাজার হাজার মানুষ তাঁকে দেখতে পেলেন ছবির পর্দায়, হাজার হাজার অনুরাগী পেয়ে গেলেন তিনি। তবে, ভূতপূর্ব সেই মানুষটি এবার চিহ্নিত হয়ে গেলেন শুধু কৌতুকাভিনেতা হিসেবে। আর, সে-অভিনয়েরও শ্রেষ্ঠ চিহ্ন ধরা রইল নিশ্চয় 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবিতে।

কোন্ গুণে এত বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন রবি ঘোষ? সকলের হয়ে বলতে পারব না, তবে আমার অনেক সময়ে মনে হয়েছে যে তাঁর কৌতুকাভিনয়ের ভিতরে দীপ্তি পেত একটা ট্র্যাজিক বোধ। হাসির সঙ্গে মাখানো থাকত একরকমের আত্মকরুণা, আর সেইজন্যেই সেটা হয়ে উঠতে পারত জীবন বিষয়ে—বিশেষত তুচ্ছ মানুষের জীবনের বিষয়ে—একটা প্রগাঢ় কারুণ্যের উপলব্ধি। এই উপলব্ধিতেই রবি ঘোষ হয়ে উঠেছিলেন যথার্থ একজন শিল্পী।

এক হিসেবে দেখতে গেলে কৌতুকাভিনয়কে মনে হতে পারে সবচেয়ে সহজসাধ্য কাজ। শরীরটাকে ভেঙেচুরে, ঠোঁটে-মুখে বিরতি এনে, স্বরের মধ্যে কিছু চাপল্য কিছু আতিশয্য এনে সহজেই দর্শকদের একেবারে আলুথালু করে দেওয়া যায় হাসিতে। মঞ্চেই বলি আর ছবিতেই বলি, এমন হাসির অনর্গল উৎসার দেখতে আমরা অভ্যস্ত, এ-রকম কৌতুকাভিনেতার কোনো কমতি নেই আমাদের দেশে। কিন্তু রবি ঘোষ এই সরল পদ্ধতিগুলির ব্যবহার করেননি। তাঁর চেষ্টা ছিল ভিন্নরকম। মুখের সামান্য ভাঁজে, পেশির ঈষৎ সঞ্চালনে, চোখের তারা বা ভুরুর ক্ষিপ্র উত্থানপতনে, দৃষ্টিকে অনায়াসে উজ্জ্বলতা বা নিষ্প্রভতায় নিয়ে যাওয়ায় কৌতুকাভিনয়ের মধ্যে একটা আভিজাত্য এনে দিতে পারতেন রবি ঘোষ। এই আভিজাত্যেই তিনি অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে আছেন।

বিদেশের একজন কমেডি-অভিনেত্রী একবার লিখেছিলেন, কৌতুকের অভিনয়ে সফল হবার জন্য অভিনেতার চাই চারটে A, আর তিনটে I—অ্যাপ্‌টিটিউড, এবিলিটি, আর্টিস্ট্রি, ইস্‌থেটিসিজ্‌ম; আর ইনটুইশন, ইনসাইট, ইনটেলিজেন্স। আমাদের দেশের কৌতুকাভিনয়ে ওই A-গুলিকে যদি-বা কখনো পাওয়া যায়, বড়ই অভাব I-গুলির। সে-অভাব অনেকখানি মেটাতে পেরেছিলেন রবি ঘোষ। তাঁর অভিনয় দেখে মনে হতে পারত যে লঘুতম চরিত্রগুলিকেও একেবারে ভিতর থেকে ছুঁতে পারছেন তিনি তাঁর ইনটুইশন দিয়ে, ইনসাইট দিয়ে, আর সর্বোপরি ইনটেলিজেন্স দিয়ে। সেটা এখন তার অন্য কারো মধ্যে তেমন সুলভ নয় বলে তাঁর মৃত্যু অনেকদিন ধরে একটা অভাববোধে আচ্ছন্ন রেখে যাবে আমাদের, কৌতুক আবার হয়তো গড়িয়ে যাবে নিছক তুচ্ছতায়।

পুনর্মুদ্রিত, বানান অপরিবর্তিত

> উৎপলদা বারবার বলতেন, শেক্‌সপিয়রের গল্প এত স্ট্রং—রবি, এখানে ডেকোরেশন, ডেকোর দিয়ে কিছু করতে পারবে না। এখানে অভিনয়—আর ড্রেস।
>
> (বিষ্ণুপ্রিয়া দত্ত ও অশোক ঘোষালকে দেওয়া সাক্ষাৎকার, এপিক থিয়েটার, মার্চ-জুন ১৯৯৭)

রবি ঘোষ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

আমরা শবাসন করছি

'অরণ্যের দিনরাত্রি'-র শুটিংয়ের সময় দুপুরের দিকে আমি ও রবি একটু ঝিমিয়ে নিতাম। আর লোকজন জিগ্যেস করলে—এই উত্তরটা দিতাম।

রবি ঘোষের সঙ্গে আমার পরিচয়ের প্রথম দিনটাই বেশ চিত্তাকর্ষক। তার আগে ওঁর 'অঙ্গার' নাটক দেখেছি। সনাতন, না কী একটা নামের পাগলের চরিত্র করেছিল! ভাল লেগেছিল ওঁর অভিনয়। পরিচয় ঘটল 'অভিযান' করার সময়। এক রোববার সত্যজিৎ রায়ের তখনকার লেক টেম্প্ল রোডের বাড়িতে গিয়েছি। রবি ঘোষও এসেছেন। পরস্পরের পরিচয় হল। দারুণ আড্ডা হল অনেকক্ষণ, যেমনটা হত মানিকবাবুর বাড়িতে। আড্ডার পর উঠলাম দু'জনে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতেও চলছিল গল্প। একতলায় নেমেও থামেনি। চলছে আড্ডার রেশ। হঠাৎ চমকে দিয়ে রবি আমাকে বললেন—'আপনি কি মদ্যপান করেন?' বললাম—'হ্যাঁ, তা করি!' আমার উত্তর পেয়ে তিনি বললেন, 'তবে চলুন, মদ্যপান করতে-করতে আড্ডাটাকে আরও একটু দীর্ঘ করি।'

রাস্তায় নেমে ট্যাক্সি ধরে সোজা দু'জন ধর্মতলার 'চাংওয়া'-তে। কয়েকটা বিয়ার নিয়ে সেই আড্ডা চলল বিকেল পর্যন্ত। মনে হল, প্রথম দিনের পরিচয় থেকেই 'বন্ধু' হয়ে গেলাম আমরা।

আর 'অভিযান' করতে গিয়ে বন্ধুত্বটা অসম্ভব ঘনিষ্ঠ হল। এরপর দু'জনে যে কত ছবি একসঙ্গে করেছি তার কোনও গোনাগুনতি নেই! 'অভিযান'-এর আগে রবি বোধহয় মাত্র একটা ছবিই করেছিল—উৎপল দত্ত-র 'মেঘ'। 'অভিযান' ওঁর প্রথম মেজর ছবি, যার সূত্রে দর্শকের নজরে এল রবি। ওই ছবির শুটিংয়েও কম মজা হত না। একটা দৃশ্য আছে—যখন আমি রুমার প্রেমিকা জোসেফের কাছে যাচ্ছি। পিছনে দাঁড়ানো রবির হাতে তখন একটা স্প্রিং সাপের খেলনা রয়েছে। সে ওটাকে নিয়ে এমন একটা কাণ্ড করল যে, মানিকবাবু মাথার ওপর থেকে কালো কাপড়টা সরিয়ে বলে উঠলেন—'এ তো রীতিমতো সিন-স্টিলার!' রবির টাইমিং সেন্স ছিল সত্যিই ঈর্ষণীয়! কী মঞ্চে, কী ক্যামেরার সামনে, উপস্থিত সব্বাইকে 'তাক' লাগিয়ে এমন একটা কাজ করে ফেলবে—ভাবাই যেত না!

ওঁর সঙ্গে আমার আজীবন বন্ধুত্বের আরও একটা কারণ—আমরা দু'জনেই ছিলাম কাছাকাছি বয়সের। আমার থেকে তিন বছরের বড় ছিল রবি। অ্যাকচুয়ালি ও ছিল বুড়োদার (তরুণকুমার) ক্লাস ফ্রেন্ড। 'অভিযান' করার সময় শেখর চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেশদার সঙ্গেও প্রচুর আড্ডা হয়েছে। সারাটা দিন শুটিংয়ের পর ছবিতে ব্যবহার করা ওই ক্রাইসলার গাড়িটা চালিয়ে রবি, আমি, শেখরদা-জ্ঞানেশদা বেরিয়ে পড়তাম। সঙ্গে থাকত এক ক্রেট বিয়ার। কোনও ফাঁকা জায়গা দেখে নেমে পড়তাম। জ্যোৎস্নায় প্রান্তর ভেসে যেত। আমাদের চলত আড্ডা আর গান। সেই বন্ধুত্ব রয়ে গেল আমৃত্যু।

এই যে আমি এখন গল্ফ গ্রিনে আছি, এর পিছনেও ছিল রবির হাত। আমি তখন থাকি সত্যজিৎ রায়ের ছেড়ে যাওয়া লেক টেম্প্ল রোডের বাড়িতে। সত্যজিৎবাবুই ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। হঠাৎই বাড়িওয়ালা রিটায়ার করে কলকাতায় থাকবেন স্থির করলেন। আর আমাকে বাড়ি ছাড়ার নোটিশ দিলেন রাতারাতি। রবি ব্যাপারটা জানত! ও গল্ফ গ্রিনে থাকে। রবিই বলেছিল, 'পুলু, চলে আয় গল্ফ গ্রিনে, এখানে প্রচুর সুবজ, সকাল-বিকেল পাখির গান শুনতে পাবি। তোর ভাল লাগবে।' তখন আমিও ঠিক করেছিলাম আর ভাড়া বাড়িতে যাব না। অনেক তো হল! রবির উদ্যোগেই আমার এখানে বাড়ি বানানো।

এবার আমরা প্রতিবেশী। মিনিট দুয়েক হাঁটলেই রবির বাড়ি। ফলে আড্ডা, ঘনিষ্ঠতা আরও বাড়ল। সময় পেলেই একে-অপরের বাড়িতে চলে যেতাম। রবিই ফোন করে বলত, 'ভাল ব্র্যান্ডি এনেছি, চলে আয়!' আর বন্‌ধ-টন্‌ধ পড়লে তো কথাই নেই। আমাদের যে কোনও একজনের বাড়িতে দিনভর খানা-পিনা-আড্ডা! বৈশাখীর সঙ্গে ওর বিয়েতে আমি তো পয়লা নম্বর সাক্ষী ছিলাম।

রবি অভিনয়ের 'গুরু' মানত উৎপল দত্তকে। উৎপলবাবু ছাড়া অন্য কারও পরিচালনায় নাটকে অভিনয় করেনি। একমাত্র ব্যতিক্রম আমি। আমার পরিচালনায় 'ঘটক বিদায়' নাটকে স্টার-এ অভিনয় করেছিল। পাঁচশো নাইটের ওপর চলেছিল নাটকটা। প্রত্যেকটা দিন ওর উপস্থিতি ছিল ঠিক একই

সময়ে। দারুণ ডিসিপ্লিন্‌ড।

আমাদের দু'জনেরই ছিল শরীরচর্চার বাতিক। রবি তো নিয়মিত ওয়েট লিফ্‌টিং করত। কিন্তু নানা কারণে বেশি দিন রেওয়াজটা চালাতে পারেনি। মনে আছে 'অরণ্যের দিনরাত্রি' করার সময় লোকশনে আমি ষোলো-ষোলো বত্রিশ পাউন্ড ডাম্বল নিয়ে গিয়েছিলাম। রোজ সকালে চলত ব্যায়াম। তাই নিয়ে ইউনিটের সব্বার কী হাসাহাসি! দুপুরবেলা লাঞ্চের পর আমি আর রবি একটু ঝিমিয়ে নিতাম। লোকজন জিগ্যেস করলে বলতাম, 'আমরা শবাসন করছি!'

'শ্রীমতী ভয়ংকরী' করছে তখন রবি ঘোষ। আমি একদিন গ্রিনরুমে বসে আছি। হঠাৎ এসে বলল—'একটা গান লিখে দিবি, নাটকে ইউজ করব।' ওখানে বসেই ক'লাইন লিখে দিয়েছিলাম। মঞ্চে গেয়েওছিল। অভিনয় নিয়েও ওঁর কাছ থেকে শিখেছি অনেক কিছু।

একটা ঘটনা মনে পড়ছে। টালিগঞ্জের একজন বন্ধু-অভিনেতা-পরিচালকের ছবিতে আমরা দু'জনেই কাজ করছি। সেট-এ দাঁড়িয়ে সেই পরিচালক আমাকে একটা অনুপযুক্ত নির্দেশ দিচ্ছিলেন। অন্তত আমার তেমনটাই মনে হচ্ছিল। আমি আমার বিচার-বুদ্ধি দিয়ে তর্ক করে যাচ্ছিলাম। বেশ কিছুক্ষণ। পাশে দাঁড়িয়ে থাকা রবি তখন আমার হাতে একটু 'চাপ' দিয়ে তর্ক চালাতে বারণ করে। আমি থেমে যাই। পরে ও আমাকে বলেছিল, 'তোর বিদ্যা-বুদ্ধি-যুক্তি নিজের জন্য রেখে দে, নিজে যখন নাটক করবি তখন ওগুলো নিয়ে ভাবিস। এখানে যে-পুজোর যে-বাদ্যি সেটাই বাজিয়ে যা।' মনে রেখেছিলাম কথাগুলো। আমার কাজের প্রতি ওর দারুণ শ্রদ্ধা ও সম্মান ছিল।

মনে পড়ছে—তখন ব্রেশটের নাটকের অনুবাদ করেছি আমি—'বিধি ও ব্যতিক্রম'। রবি তখন 'চলাচল' নামে একটা নাটকের দল করেছে। আমায় এসে বলল, 'তোর অনুবাদ নাটকটা দিবি, আমরা করব।' দিয়েছিলাম, করেওছিল। আমি আর ওটা করিনি।

ওঁর চলে যাওয়াটাও তো আমার চোখের সামনে। দিনটা এখনও মনে আছে, ৪ ফেব্রুয়ারি। আমি, মনোজদা আর রবি—তিনজনই শুটিং করছি তপন সিংহ-র সিরিয়াল 'হুতোমের নকশা'-য়। নিউ থিয়েটার্স এক নম্বর স্টুডিও-র মেক-আপ ঘরে জোর আড্ডা হচ্ছিল শুটিং শুরুর আগে। অভিনয় নিয়েই আলোচনা। কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন তুলসী চক্রবর্তী। লাঞ্চের পর, লাইট-টাইট ঠিক করে আমাকে ও মনোজদাকে ফ্লোরে ডাকলেন তপনদা। রবি কথা বলতে-বলতে সোফায় শুয়ে পড়েছিল। ছোটখাটো চেহারা, অসুবিধে হয়নি। আমার শট নেওয়ার পর ডাক পড়ল রবির। অ্যাসিস্ট্যান্ট পলাশ ব্যানার্জি মেক-আপ রুম ঘুরে এসে বলল, 'রবিদা তো বেশ অসুস্থ! শুয়ে আছেন।'

সঙ্গে-সঙ্গে সবাই ছুটে আসি মেক-আপ ঘরে। ততক্ষণে তাঁকে ধরে-ধরে গাড়িতে তোলা হচ্ছে। চেতনাহীন চেহারা। আমরা সব্বাই কেমন বিহ্বল। আমি টেবিল থেকে রবির চশমাটা নিয়ে গাড়ির পিছন-পিছন। মনে হচ্ছিল—জ্ঞান ফিরলেই তো চশমাটা চাইবে রবি। কাছেই একটা নার্সিং হোমে নেওয়া হল। ওরা ভর্তি করল না। গাড়ি চলল এরপর বাঙুর হাসপাতালে। ওখানে ঢুকেই আর্টিফিসিয়াল রেসপিরেশনের চেষ্টা হল। তখনই বুঝলাম, ফ্যাটাল কিছু ঘটে গিয়েছে। এক মহিলা ডাক্তার ছিলেন সামনে। আমি ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'জাস্ট টেল মি, ইজ হি অ্যালাইভ?' উত্তরে তিনি ঘাড় নাড়লেন।

ব্যস! বাংলা সিনেমায় কমেডি-ঘারানার একটা যুগ শেষ হয়ে গেল। ইতিমধ্যে বৈশাখী বউদির কাছে খবর পৌঁছে গিয়েছে। তিনি ছুটেছেন স্টুডিও-র দিকে। আমার সঙ্গে পথে দেখা! জিগ্যেস করলেন, 'বলুন পুলুদা? ঠিক কী হয়েছে বলুন?' আমি আর কী বলব! বললাম—'এখুনি হাসপাতালে যান।'

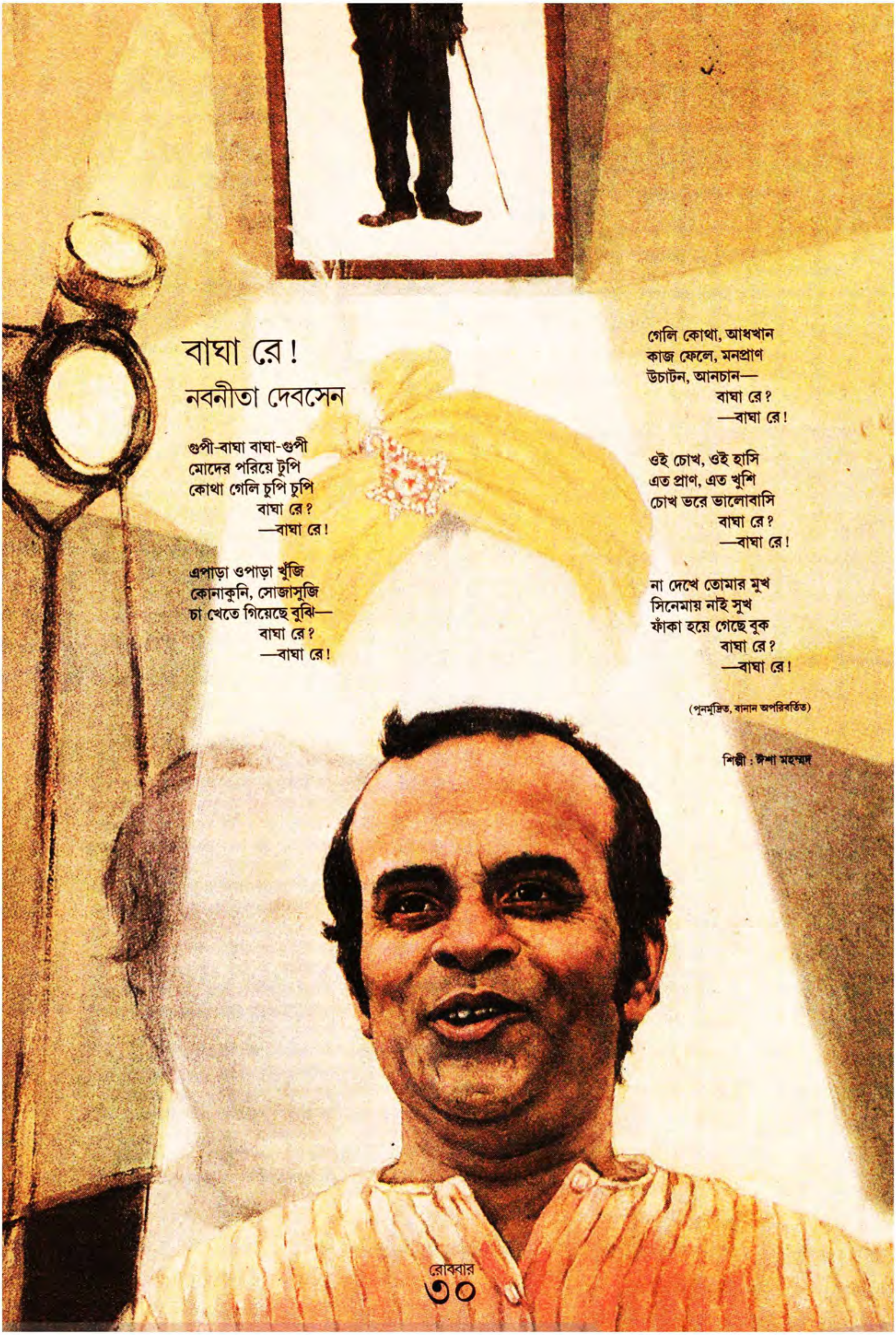
সেদিন সন্ধ্যায় আমার 'টিকটিকি' নাটকের শো ছিল। সুতরাং সেটা তো আর বাতিল করা যায় না! অভিনেতা আমরা, আমাদের কাজটা তো এই-ই। অভিনয়ও করলাম। করতেই হয়। রবির চলে যাওয়ায় দরিদ্র হয়েছে বাংলা সিনেমা।

আমি নিজে এখনও বিপর্যস্ত বোধ করি রবির অনুপস্থিতিটাকে। অভিনয়ের জন্য তো বটেই, ব্যক্তিগত ভাবেও।

অনুলিখন

বলি, শরীরটা তো রাখতে হবে! আশুতোষ কলেজের ব্যায়ামাগারে





বাঘা রে!

নবনীতা দেবসেন

গুপী-বাঘা বাঘা-গুপী
মোদের পরিয়ে টুপি
কোথা গেলি চুপি চুপি
বাঘা রে?
—বাঘা রে!

এপাড়া ওপাড়া খুঁজি
কোনাকুনি, সোজাসুজি
চা খেতে গিয়েছে বুঝি—
বাঘা রে?
—বাঘা রে!

গেলি কোথা, আধখান
কাজ ফেলে, মনপ্রাণ
উচাটন, আনচান—
বাঘা রে?
—বাঘা রে!

ওই চোখ, ওই হাসি
এত প্রাণ, এত খুশি
চোখ ভরে ভালোবাসি
বাঘা রে?
—বাঘা রে!

না দেখে তোমার মুখ
সিনেমায় নাই সুখ
ফাঁকা হয়ে গেছে বুক
বাঘা রে?
—বাঘা রে!

(পুনর্মুদ্রিত, বানান অপরিবর্তিত)

শিল্পী : ঈশা মহম্মদ



শিল্পী : শুভাপ্রসন্ন

কৌতুক অভিনেতার মৃত্যু

জয় গোস্বামী

ময়লা সূর্যের সামনে দিয়ে
উড়ে উড়ে যায় ভস্মরাশি
আমরা অনেক রাস্তা হেঁটে
সেদিকে তাকিয়ে থাকতে আসি

সামনে ধূ ধূ পড়ে আছে মাঠ
ঢালু হল দিগন্ত দুপাশে—
হাঁটতে গেলে পা ক্ষতবিক্ষত
পুড়ে শক্ত কাঁটা হওয়া ঘাসে

সেই মাঠে একটি গাছও নেই
ছায়া নেই, দু এক পলক
তার মধ্যে আবছা দেখা যায়
ছোট হয়ে আসা একটি লোক

কাচ, কাঁটাতার উঠে থাকা
সেই মাঠে সে হাঁটে, চলে, ঘোরে—
একেকটি মুদ্রায় হাত থেকে
আনন্দ ঝাপটানো পায়রা ওড়ে

আকাশে উঠলেই অকস্মাৎ
পাখিতে আগুন ধরে যায়
দিকভ্রম? শান্তি-কবুতর
সোজা গিয়ে সূর্যে ধাক্কা খায়

কয়েক মুহূর্ত পরে তার
দু একটি স্ফুলিঙ্গ ঝরে পড়ে
লোকটি তবু খেলাই দেখায়
নিজ মৃত্যুশয্যার উপরে

শয্যা নয়, খোলা মঞ্চ, খোলা—
দিগন্তে দুদিকে পর্দা টানা
পর্দায় কয়েক বিন্দু পাখি—
মাটিতে সে-লোকটি পেল ডানা

ডানা সে ঝাপটায়! এই বার
সে-ই উড়বে পাখির বদলে,
সূর্যে উঠবে? ভস্ম হবে? ছাই?
কী হবে তা জানি তো সকলে।

তা সত্ত্বেও বহু রাস্তা হেঁটে
আমরা তাকিয়ে থাকতে আসি
ময়লা সূর্যের সামনে দিয়ে
উড়ে উড়ে যায় ভস্মরাশি!

(রবি ঘোষের মৃত্যুর পর লেখা, পুনর্মুদ্রিত, বানান এক)

রবি ঘোষ নি মা ই ঘো ষ

ঘুমিয়ে পড়া অ্যালবাম

নানা টানাপোড়েনের জেরে অনুভাদি'র সঙ্গে সম্পর্কটাই ভেঙে পড়ার উপক্রম। তখন আমি ও ভোলা বুঝিয়েছিলাম রবিদাকে।

'মাইরি, যদি একটু লম্বা হতাম!'

এই একটাই আক্ষেপ শুনেছি রবিদার মুখে। আর আমিও একথার সঙ্গে দ্বিমত নই। যদি আর একটু লম্বা হতেন, তা হলে হয়তো দর্শকদের কাছে শুধুমাত্র কমেডিয়ান হিসেবে পরিচিত হতেন না।

রবিদা, মানে রবীন্দ্রনাথ ঘোষদস্তিদারের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের কথা উঠলে—পাড়া-সম্পর্কের কথাই বলতে হয়। হ্যাঁ, রবিদা আমার পাড়ার লোক। ৪৭ নম্বর মহিম হালদার স্ট্রিটে থাকতেন। আমার বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়েই স্কুলে যেতেন। কিন্তু একাধিকবার দেখা-সাক্ষাৎ হলেও 'নিবিড় ঘনিষ্ঠতা' যাকে বলে—সেটা ছিল না। সেটা হল যখন কলেজে পড়ি তখন, কিছুটা অপ্রত্যাশিত ভাবেই। আমি কলেজের যাবতীয় নাটকে পার্ট করতাম। আর আমার সঙ্গে সব নাটকেই অভিনয় করত আমার বন্ধু তরুণ মিত্র। সে তখন 'লিট্‌ল থিয়েটার' গ্রুপেও অভিনয় করে। যাই হোক, তরুণ একদিন আমাদের শো-তে রবিদা আর সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়কে আসতে বলল। ঠিক কী নাটক মনে পড়ছে না। তবে নাটকের শেষে রবিদা নিজেই এগিয়ে এসে আমাকে জিগ্যেস করেন, 'তুমি কি আমাদের গ্রুপে নাটক করবে? আমরা শেক্সপিয়রের নাটক করি।' উত্তরে আমি বলেছিলাম, 'বাবাকে জিগ্যেস করে আমি জানাব।' আশঙ্কা ছিল, পড়াশুনোর ক্ষতি হতে পারে ভেবে বাবা হয়তো অনুমতি না-ও দিতে পারেন! কিন্তু 'শেক্সপিয়রের নাটক' শুনে আমার পিতৃদেব আর অমত করেননি। আমিও খুব উৎসাহিত হয়েছিলাম। রবিদার হাত ধরেই উৎপল দত্তর সান্নিধ্যে আসি, যদিও রবিদাই ছিলেন আমার 'প্রকৃত গাইড'।

আমরা তখন 'অঙ্গার' নাটকে অভিনয় করছি। মিনার্ভা-তে শো। একদিন সেখানে হাজির সত্যজিৎ রায়। নাটক শেষে তাপস সেনকে দিয়ে বলে পাঠালেন, আমাকে আর রবিদাকে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে। সালটা ১৯৫৯। আমরা গেলাম ওঁর বাড়ি। সিঁড়িতে দাঁড়িয়েই কথা হল। তখন তো এত ফোনের চল ছিল না! উনি নিজের ডায়েরিতে লিখে রাখলেন আমাদের বাড়ির ঠিকানা। তারপর যখন 'অভিযান' ছবিটি করলেন, তখন ডাক পড়ে আমাদের।

টুকটাক নানা বিষয়ে মনোমালিন্যের কারণে রবিদা-সহ আরও কিছু অভিনেতা 'লিট্‌ল থিয়েটার' থেকে বেরিয়ে 'চলাচল' বলে একটা দল গঠন করেন। আমিও বেরিয়ে এসেছিলাম। এই 'চলাচল'-এ নাটক করার সময়েই রবিদা-র ডাক পড়ে 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবিতে অভিনয়ের জন্য। এর ফলে, 'চলাচল' হয়ে গেল প্রায় অচল। আর আমরা? কার্যত কাঠবেকার।

ইতিমধ্যে একদিন কাকতালীয় ভাবে আমার হাতে আসে একটা ফিক্সড লেন্স 'ক্যানেনেট' ক্যামেরা, আর কাটপিস ফিল্ম। রবিদা তখন রামপুরহাটে। 'বাঘা'-র সাজে রিহার্সালে ব্যস্ত। আমার কী মনে হল জানি না, চলে গেলাম রামপুরহাট। রবিদার সঙ্গে দেখা করতে। সেখানে গিয়ে রিহার্সালেরই কিছু ছবি তুলে ফেললাম। রবিদা-কে ইন্‌স্ট্রাকশন দিচ্ছেন মানিকদা—এই ছিল আমার প্রথম তোলা ছবি। ছবিটা দেখে মানিকদা বললেন—'আপনি তো একেবারে আমার অ্যাঙ্গেল মেরে দিয়েছেন, যান যান'—বলেই সেট-এর দিকে ঠেলে দিলেন। আর সেই থেকেই আমার কাজ শুরু। রবিদা সেই সময় মানিকদার ছবিতে শুটিং না-করলে এই আকস্মিক যোগাযোগটা হয়তো ঘটতই না! কাজেই স্বীকার করতে কোনও বাধা নেই, আজ আমি নিমাই ঘোষ হয়ে ওঠার পিছনে প্রাথমিক ভাবে যাঁর অবদান সবচেয়ে বেশি, তিনি রবি ঘোষ। পরিচয়ের প্রথম দিন থেকে শুরু করে শেষ দিন অবধি রবিদা আর আমার সম্পর্কে কখনও কোনও ছেদ-চিহ্ন বসেনি। আক্ষরিক অর্থেই আমরা ছিলাম 'হরিহর আত্মা'। লোকজনের কাছে আমাকে আলাপ করিয়ে দেওয়ার সময় রবিদা বলতেন—'এই যে, আমার ভাই।' শুধু যে স্নেহ করতেন তা নয়, প্রয়োজনে নানাবিধ পরামর্শও নিতেন।

মনে পড়ে, রবিদা আর অনুভাদি'র প্রেমের দিনগুলো। উফ, কী রোমাঞ্চকর এবং ভয়ঙ্কর দিন ছিল সেসব! আমরা তখন 'কর্ণার্জুন'-এ একসঙ্গে পাঠ করি। নাটকের পর রবিদা বললেন—'চল, তোকে



'আমার প্রথম ছবি। বাঘা-কে নির্দেশ দিচ্ছেন সত্যজিৎ রায়।' ছবি : নিমাই ঘোষ

আজ একটা সারপ্রাইজ দেব।' নিয়ে গেলেন অনুভাদি-র সঙ্গে দেখা করাতে। 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' ছবিটা করার সময় রবিদা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। অনুভাদি'র প্রচণ্ড সেবাযত্নে সে-যাত্রায় সুস্থ হয়ে ওঠেন। আর সেই সময় থেকেই দু'জনের মধ্যে গড়ে ওঠে সম্পর্ক। অনুভাদির সঙ্গে আমার প্রথম মোলাকাতেই রবিদা জানিয়ে দিতে ভুললেন না যে, আমি রবিদার ভাই। তারপর থেকে যতবারই দু'জনে দেখা করেছেন, আমি উপস্থিত ছিলাম। সাধারণত 'গ্রেট ইস্টার্ন'-এ দেখা করতেন ওঁরা। ভোর চারটে-সাড়ে চারটের সময় রবিদাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে তারপর আমি ফিরতাম। ওঁদের দু'জনের এই প্রেমকে ঘিরে কম ঝামেলা হয়নি। মাঝ রাতে ছুরি দিয়ে রবিদাকে খুন করার চেষ্টা পর্যন্ত করা হয়েছে। আমি সেবার প্রাণরক্ষা করেছিলাম। বলা বাহুল্য, এই ঘটনার পর রবিদা আর অনুভাদি দু'জনেই খুব ভেঙে পড়েছিলেন।

বাইরের বিভিন্ন টানাপোড়েনের জেরে একটা সময় তো সম্পর্কটাই ভেঙে যাওয়ার উপক্রম। তখন আমি আর ভোলা (ভোলা দত্ত, রবিদার আরেক স্যাঙাত) রবিদাকে নিয়ে পুরীতে চলে গেলাম। দু-তিনদিন ধরে বিস্তর কথাবার্তা হল, আমরা বোঝালাম রবিদাকে। কার্যত ইনসিস্ট করলাম, যাতে কোনও বাহ্যিক চাপের মুখে নতিস্বীকার করে অনুভাদি'র সঙ্গে সম্পর্কটা না-ভাঙেন। রবিদা বুঝলেন। রাজি হলেন বিয়ে করতেও। সেই বিয়ের সাক্ষী হলাম আমি আর ভোলা। দুর্ভাগ্য, অনুভাদির সঙ্গে রবিদার বিবাহিত জীবন প্রচণ্ড সুখের হলেও, দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। অকালেই মারা যান অনুভাদি। শক্ত ধাতের মানুষ রবিদা ভেতরে-ভেতরে ভেঙে পড়েছিলেন খুব, তবে সব সময় চেষ্টা করতেন কাউকে বুঝতে না-দিতে।

মানুষটা কখনও জ্ঞানত কাউকে দুঃখ দেননি। বরং অন্যের দুঃখে, অসুবিধায় সবার আগে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। হয়তো কোনও দুঃস্থ বন্ধুর মেয়ের বিয়ে—জানতে পারামাত্র খাওয়াদাওয়া, অতিথি আপ্যায়নের সমস্ত দায়িত্ব তুলে নিলেন নিজের কাঁধে। কিংবা হয়তো নবদম্পতির জন্য ফার্নিচার বানিয়ে দিলেন। সোজা কথায়, স্বজনপোষণ ও বন্ধুকৃত্য পালনে কখনও পিছপা হননি। অথচ অনেকেই পরে ওঁর ভালমানুষির সুযোগ নিয়ে ওঁকে নির্মমভাবে ব্যবহার করেছেন! যদিও রবিদার মুখে কদাচ পরনিন্দা শুনেছি। রাগও প্রকাশ করতে দেখিনি। গাল-মন্দ করা, কথায়-কথায় খারাপ শব্দ ব্যবহার করা—এসব ওঁর ধাতে ছিল না। অন্তত আমি তো শুনিনি। শুধু 'মাইরি' বলার ম্যানারিজম ছিল। প্রায়শই কথা বলার আগে একটা 'মাইরি' যোগ করতেন।

'প্রফেশনাল' এবং 'পারসোনাল' : দু'ক্ষেত্রে দুই ভিন্ন চরিত্রের মানুষ ছিলেন রবিদা। রিহার্সাল, স্ক্রিপ্ট-রিডিং থেকে শুরু করে মেক-আপ রুমেও—বড্ড সিরিয়াস। কাজের প্রতি অসম্ভব সিনসিয়ার। অন্যেরা কে কীরকম অভিনয় করছে—সেসব খুঁটিয়ে খেয়াল করতেন। আর ছিল 'ইম্প্রোভাইজ' করার অসামান্য দক্ষতা। মনে পড়ে, 'অরণ্যের দিনরাত্রি'-র শুটিং চলছে। 'মেমরি গেম' সিকোয়েন্স। 'অতুল্য ঘোষ' বলে হঠাৎই রোদ-চশমাটা মাথার ওপর তুলে দিলেন। মানিকদা 'কাট' বলার আগেই হেসে ফেলেছিলেন।

কিন্তু কাজের বাইরে, এই নিয়মনিষ্ঠ মানুষটাই কোনও এক আশ্চর্য ম্যাজিকে হয়ে যেতেন দিলখোলা, আড্ডাবাজ। কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে প্রায় নিয়মিত আড্ডার একটা আসর বসত। উৎপল দত্ত, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি সেনগুপ্ত, সমরেশ, ভোলা, আমি হাজির হতুম। সেখানে গালগল্প চলত, তেমনই চলত নানা বিষয়ে পলিটিকাল আলোচনা। এলটিজি-র প্রায় সবাই-ই তো ছিলেন বাম-ঘেঁষা!

মানিকদা অসম্ভব পছন্দ করতেন রবিদাকে। হয়তো কোনও ছবিতে রবিদা নেই, তবু স্ক্রিপ্ট পড়ার সময় ডেকে নিতেন ওঁকে। আর রবিদার মুখেও শুনেছি, মানিকদা আর তপনদা ছাড়া অন্য কোনও পরিচালকের সঙ্গে 'কাজ' করে উনি বিশেষ খুশি হননি। আসলে রবিদা ছিলেন ভার্সেটাইল অ্যাক্টর, শুধুই একজন 'কমেডি'-অভিনেতা নন। নিজের কাজ নিয়েই ডুবে থাকতেন, অষ্টপ্রহর ভাবতেন কী করে নিজেকে আরও 'শার্প' করা যায়! পরশ্রীকাতরতা নৈব নৈব চ।

'নিউ ক্যাথে'-র প্রন বল, 'নিজাম'-এর রোল—খেতে খুব ভালবাসতেন। পানাসক্তিও ছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে শরীরেরও অত্যন্ত যত্ন নিতেন। যতই 'লেট নাইট' হোক, ভোর-ভোর উঠে ব্যায়াম করবেনই। ভীষণ খুঁতখুঁতে ছিলেন পোশাকের ব্যাপারে। বেছে-বেছে জামাকাপড় পরতেন। একবার নতুন একটা 'ল্যান্ডমাস্টার' কিনে হঠাৎই বললেন—'চল বেরিয়ে আসি।' ব্যস, চলে গেলাম ধানবাদ। এরকম প্রায়ই হত। ধানবাদ, বার্নপুর, তোপচাচি—বিনা নোটিশে আমরা বেরিয়ে পড়তাম। এত কাছ থেকে দেখেছি মানুষটাকে, শুধু একটাই অভিযোগ : ছবির পরিচালনায় না-গেলেই পারতেন!

অনুলিখন পারমিতা গাইন

রবি ঘোষ অ্যান্ড্রু রবিনসন

সিকন্দরের শিস



পরিচালকের নির্দেশের বাইরে গিয়ে নিজেকে বেশি করে মেলে ধরার দিকে আমার ঝোঁক ছিল। এবং আমি যত বেশি-বেশি করতাম, ওঁরাও তত বেশি করে আমাকে প্রশ্রয় দিতেন। ফলে শেষ পর্যন্ত গোটা জিনিসটাই রদ্দি হয়ে যেত। কিন্তু মানিকদার ব্যাপারটা ঠিক উল্টো।

কার্টুন : চণ্ডী লাহিড়ী

সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে যতজন অভিনেতা কাজ করেছেন, তাঁদের সকলের মধ্যে রবি ঘোষের সঙ্গে কথা বলেই সবচেয়ে বেশি আনন্দ পেয়েছিলাম। প্রায় বছর দশেক আগে ওর সাক্ষাৎকার নিই, সেই সময় সত্যজিতের জীবনী 'দ্য ইনার আই' লেখার জন্য 'রিসার্চ' করছিলাম। কত দিন হয়ে গেল সে-ঘটনার, তবু আজও পুরনো প্রতিলিপিটা যখন খুলে বসি, রবি-কে যেন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাই। শুনতে পাই রবি কথা বলছে ওর কলকাতার বাড়িতে বসে, সেই খোলামেলা ভঙ্গি, প্রতিটা শব্দ উচ্চারণের সময় সেই কৌতুক আর সততার মিশেল, কথা বলার টোন-এ সেই জোরালো প্রত্যয়। 'অভিযান' থেকে 'আগন্তুক'—সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে যে-ক'টা ছবি করেছে রবি, সবেতেই ও অনবদ্য। আমি ওর অভিনয়ের মুগ্ধ অনুরাগী। তা সত্ত্বেও, এতগুলো ছবির মধ্যে থেকে কোন 'রোল'-টা আমার বিশেষভাবে মনে ধরেছে, মানে কোনটার প্রতি আমার স্পেশ্যাল অ্যাটাচ্‌মেন্ট আছে, সে-প্রসঙ্গ যদি ওঠে—অবশ্যই 'জন অরণ্য'-তে 'মিস্টার মিত্র' নামে ছিমছাম, মাপাজোকা, নিখুঁত, উপরিমহলে ঘোরাফেরা করা দালালের যে-চরিত্রটা ও করেছিল, তার উল্লেখ করব। ওই রোল-টাতে রবি এমন আশ্চর্যভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল যে, মনে হচ্ছিল লোকটাকে বুঝি আর পর্দার মধ্যেই ধরা রাখা যাবে না! কী করে এই অসাধ্যসাধন করলে—প্রশ্নটা যখন জিগ্যেস করেছিলাম—রবি বলেছিল : 'মানিকদাই আমাকে দিয়ে সব কিছু করিয়ে নিয়েছিলেন—এক্সপ্রেশন, ডেলিভারি, টাইমিং, পেস, গ্যাপ—সবই। আমি তো বলব মানিকদা নিজে একজন নিপুণ অভিনেতা। এক সমালোচককে আমি বলেওছিলাম, ভাববেন না যে সত্যজিৎ রায়ের অভিনেতারা সবাই এক্কেকজন কেউকেটা। প্রয়োজনে উনি গরুকে দিয়েও অভিনয় করিয়ে নিতে জানেন।'

বলা বাহুল্য, রবি এই কথাগুলো বলেছিল বিনয় করে। রবি নিজে ভীষণ দক্ষ আর বুদ্ধিমান অভিনেতা। সেই সঙ্গে ছিল অসাধারণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এবং রসবোধ। 'অভিযান'-এ (রায়ের সঙ্গে প্রথম সিনেমা) ওর 'রোল'-টা ছিল ট্যাক্সি ক্লিনারের। রবি আমাকে বলেছিল : 'সেই সময় কালীঘাটে একটা ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের কাছাকাছি জায়গায় থাকতাম। ফলে অনেক দিনই সুযোগ পেয়েছিলাম ট্যাক্সি যাঁরা ঝাড়াইপোছাই করেন, খুব কাছ থেকে তাঁদেরকে লক্ষ করার। দেখতাম ওঁদের হাবভাব, কী করে ওঁরা কথাবার্তা বলেন। খেয়াল করতাম, কখনও-কখনও ওঁরা কিছুটা আবছায়া রেখেই নিজেদের মধ্যে কথা চালাচালি করেন। সেগুলোকেই তুলে ধরেছিলাম, এবং মানিকদা আমার সেই অনুকরণের ক্ষমতা দেখে ভারি খুশি হয়েছিলেন। উপরন্তু বলেছিলেন : 'রবি তুমি দেখবে এই ক্লিনারদের আরও একটা অভ্যাস আছে, ওরা থেকে-থেকেই শিস দিয়ে

ওঠে। আমি সেটাকেও 'ডাব' করতে চাই।' তখন আমি ওঁকে বললাম, 'মানিকদা আপনি কি সরাসরি আমার কাছ থেকেই ওটা চাইছেন?' উনি বললেন, 'কাজটা কিন্তু বেশ শক্ত।' আমি বললাম, 'হোক, পারব। ভদ্রলোকরা সাধারণত শিস দেন না, তবে আপনি যদি চান আমি এখনই শিস দিয়ে দেখাতে পারি।' উনি বললেন, 'তাই বুঝি! করো।' বলা মাত্র, 'শিস দিয়ে দেখিয়ে দিলুম। উনি এত খুশি হয়েছিলেন, কী বলব, ছবিতে তিন-চার জায়গায় আমার ওই শিস দেওয়াটা রেখে দিলেন।'

'অভিযান'-এ রবি নানারকম অদ্ভুত ভঙ্গিতে তালি দেওয়া ও চাপড় মারার কায়দা রপ্ত করেছিল। এরকম একটা ঘটনার কথা বলি। রবি সাক্ষাৎকারে বলেছিল, "শুটিংয়ের মধ্যেই হেঁটে যেতে-যেতে আমি দেখলাম যে এক জায়গায় একটা বলদ গ্যাঁট হয়ে বসে আছে। ঠিক করলাম, একটা তুড়ক লাফে ওকে টপকে চলে যাব। যদি ভুল হয়, তা হলে তো মানিকদা 'কাট' বলে দেবেনই। নইলে মিটে গেল। যেমন ভাবা তেমনই কাজ। লাফালাম। এবং সঙ্গে-সঙ্গে বলদটাও উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। যারা আশেপাশে জড়ো হয়ে শুটিং দেখছিল, অমনি সবাই মিলে হইহই করে উঠল। তৎক্ষণাৎ শট-টাও সম্পূর্ণ হল। যা-যা করেছিলাম, কোনওটাই কিন্তু মানিকদা করতে বলেননি। আমার ওপর এরকম করার কোনও নির্দেশই ছিল না। পরে তাই বলেছিলাম, 'মানিকদা, আমি দুঃখিত।' তখন উনি আমাকে বলেন, 'আরে না না, যা করেছ খুবই সুন্দর হয়েছে।'"

রবি একান্তে আমাকে বলেছিল, "'পরিচালক যা নির্দেশ দিচ্ছেন, তার বাইরে গিয়ে নিজেকে বেশি করে মেলে ধরার দিকে আমার বরাবরই একটা ঝোঁক ছিল জানো। অন্যান্য পরিচালকের ক্ষেত্রে দেখেছি, আমি যত বেশি-বেশি করতাম, ওঁরাও তত বেশি করে আমাকে প্রশ্রয় দিতেন। ফলে শেষ পর্যন্ত গোটা জিনিসটাই রদ্দি হয়ে যেত। কিন্তু মানিকদার ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। ওঁর সঙ্গে কাজ করার সময় আমি জানতাম, ঝোঁকের বশে যদি অতিরিক্ত কিছু করেও বসি, তা হলে উনি বলবেন, 'রবি, ভাল হয়েছে। কিন্তু করবে না।'"

টেলিভিশন, থিয়েটার বা যাত্রায় অন্য পরিচালকদের সঙ্গে রবি কী ধরনের কাজ করেছিল তা আমি দেখিনি। তবে যতটা জানি, রায়ের সঙ্গে কাজ করে ওর যত না নাম-খ্যাতি হয়েছিল (উজ্জ্বল ব্যতিক্রম 'গুগাবাবা'-র মতো ক্লাসিক)—তার চেয়ে ঢের বেশি অর্থ ও যশ পেয়েছিল এসব মাধ্যমেই। আমার মনে হয়, যে কোনও প্রথম শ্রেণির সংবেদনশীল অভিনেতার মতোই একরকমের দ্বন্দ্ব ওর ভেতরে ছিল, যেটা ওকে কুরে-কুরে খেত। রবি আমাকে বলেছিল "বুঝলে, এই সময়ের আধুনিক ভক্তরা খুবই অস্থিরমতি। চরিত্রটা কেমন, সে ব্যাপারে ওদের কোনও ধ্যানধারণা নেই, অথচ অল্পতেই তোমার পিঠ চাপড়ে দেবে, প্রশংসা করবে। এটা ঠিক যে, প্রচণ্ড ভালবাসা থেকেই ওরা এমনটা করে, কিন্তু ভালবাসার জানানোর এই ধরনটা অভিনেতার পক্ষে অত্যন্ত খতরনাক। বিগত দশ-বারো বছর হিন্দি সিনেমা দেখে আমার এই ধারণা আরও পোক্ত হয়েছে। এই লারেলাপ্পা সিনেমাগুলো, সারা দেশ জুড়েই, দর্শকের রুচি ও বোধকে বারেবারে পাল্টে-পাল্টে দিচ্ছে। রাজস্থানে আমি এই জিনিস দেখিছি, সেই একই জিনিস আমি দেখেছি উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি বা বিহারের প্রত্যন্ত এলাকায়। এই যে অমিতাভ বচ্চন, একদিন ওঁকেও আমি বলেছিলাম : 'তুমি তো তরুণ প্রজন্মের মাথা খাচ্ছো।' অমিতাভ আমাকে বললেন, 'আরে দাদা, কেন এমন বলছেন বলুন তো?' আমি বললাম, 'তুমি নিজে তো একজন গুণী ও দক্ষ অভিনেতা, তুমি ভাল-ভাল রোলে অভিনয় করতেই পারো।' আমার যেটা মনে হয় জানো, ও একটু সংশয়ে ভুগত, পাছে যে-উচ্চতায় ও রয়েছে, সেই ইমেজটা একটু ধাক্কা খায়!"



'সাধু যুধিষ্ঠিরের কড়চা'-র সেট-এ। ছবি সৌজন্য দেবাশিস বসু

> থিয়েটার থেকেই অভিনয় সম্পর্কে যা কিছু শিক্ষা। অভিনয়ে ঐ দীর্ঘ অনুশীলন পরে খুব কাজে লেগেছিল। একটা ব্যাপারে খুবই confident ছিলাম। প্রথম যখন সিনেমায় অভিনয় করতে আসি, এটা জানতাম যে fundamentals of acting নিয়ে কেউ খুব জ্ঞান দিতে পারবে না।
>
> (প্রলয় শূর-কে দেওয়া সাক্ষাৎকার, 'পটভূমি' জুলাই ১৯৯৭)

দর্শকরা সত্যিই কী চায়, এ ব্যাপারে রবির সঙ্গে আমার আরও কিছু কথাবার্তা হয়েছিল। ও আমাকে বলেছিল, 'বুঝলে, আমি নিজে একজন আধুনিক মনের মানুষ, কিন্তু শরৎচন্দ্র পড়তে দিলে আমি পাঁচ-ছ'পাতা পড়েই কেঁদে ফেলব। এর মানে কিন্তু এই নয় যে, আমি শরৎচন্দ্রের বিরাট ভক্ত, তথাপি কেঁদে ফেলব, পড়ার অভিঘাতটা সামলাতে পারব না। এতগুলো বছর হেথাহোথা বহু জায়গায় ঘুরে-বেড়িয়ে আমি যেটা বুঝেছি : প্রশ্নটা যখন কান্না ও বিষাদের, দর্শকরা চায় অভিনেতাও ওই বিষাদটার মধ্যে ডুবে যাক, যে কোনও মূল্যে, প্রকাশভঙ্গির তোয়াক্কা না-করে। টিপিক্যাল ভারতীয় দর্শক আসলে এমনই।' সত্যজিৎ রায় এবং তাঁরও আগে রবীন্দ্রনাথ টেগোর লোক-কাঁদানোর এই জনপ্রিয় কৌশল থেকে সযত্নে নিজেদের বিরত রাখতে পেরেছিলেন, কিন্তু শরৎচন্দ্রের লেখার মধ্যে আবেগকে লাগাম পরানোর সেই ব্যাপারটা নেই।

একদা, শরৎচন্দ্রের কোনও এক গুণমুগ্ধ ভক্ত তাঁকে রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বড় লেখক বলায়, তীব্র তিরস্কার করে শরৎবাবু ওই তৈলমর্দনকারীকে বলেছিলেন যে, 'হ্যাঁ মশাই, আমিও তাই মনে করি। তবে কী জানেন, আমি লিখি আপনার মতো পাঠকের জন্য, আর রবীন্দ্রনাথ লেখেন আমার মতো পাঠকের জন্য।' রবি ঘোষের মধ্যেও, অনেকটা শরৎচন্দ্রের মতোই, পাঁচজনকে চট করে আপ্লুত করার একটা সহজাত ক্ষমতা ছিল—কিন্তু এই রবি ঘোষই যখন সত্যজিতের রায়ের ছবিতে অভিনয় করেছেন, তখন তিনি চন্দ্রস্পর্শের অভিলাষ রাখতেন, এবং কখনও-কখনও আক্ষরিক অর্থেই চন্দ্রকে স্পর্শ করতে পেরেছিলেন।

'রবি ঘোষ' স্মারক সংকলন থেকে অনূদিত

রবি ঘোষ চিন্ময় রায়

যা, হয়ে গেল তোর!



রবিদার মতো পারফেক্‌শনিস্ট জীবনে খুব কম দেখেছি। কাজের প্রতি অদ্ভুত প্যাশন ছিল। কিছুটা থিওরি মেনে অভিনয় করতেন ঠিকই, কিন্তু ওঁর মতো অমন নিখুঁত অভিনয়-ক্ষমতা কমজনেরই ছিল।

যে তিন-চারজন কৌতুকাভিনেতা আমাকে ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন, রবি ঘোষ তাঁদের অন্যতম। রবিদা'র সঙ্গে আমার পরিচয় নাটকের সূত্রে। পরবর্তী কালে উনি যখন বাংলা চলচ্চিত্র জগতের অন্যতম উজ্জ্বল তারকা, তখন আমি 'গল্প হলেও সত্যি' ছবিতে ওঁর সঙ্গে একটা ছোট রোলে অভিনয় করার সুযোগ পাই। সেই থেকেই জমে ওঠে আলাপ। অত বড় মাপের একজন অভিনেতার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার অভিজ্ঞতা—এককথায় যাকে বলে অভূতপূর্ব! একজন অভিনেতা একই সঙ্গে কীভাবে নাটকের মঞ্চ এবং চলচ্চিত্রে সমানভাবে সাবলীল হতে পারেন, ওঁকে দেখে শিখেছিলাম।

ওঁর অভিনীত আমার দেখা প্রথম নাটক—'নীচের মহল'। উনি মানতেন, নাটক-ই অভিনয়ের শেষ কথা। পরবর্তী সময়ে উনি উৎপলদার (দত্ত) 'এলটিজি' ছেড়ে 'চলাচল' নামে একটা দল গড়ে তোলেন। যে-বিষয়টা আমায় অবাক করত, তা হল—'চলাচল'-এর প্রায় প্রত্যেকেই এসেছিলেন উৎপলদার দল থেকে। কিন্তু আজ পর্যন্ত জানতে পারিনি, ওঁদের মতবিরোধ কী নিয়ে হয়েছিল, এমনকী রবিদাকে চিরকাল দেখেছি উৎপলদার প্রশংসা করতে। আমি নিজেও এরকম একটা ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলাম, যখন আমরা প্রায় ১৯ জন 'নান্দীকার' থেকে বেরিয়ে এসে 'থিয়েটার ওয়ার্কশপ' গড়ে তুলেছিলাম। সেই সময় পারিপার্শ্বিক নানা ধরনের সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয়েছিল, একান্ত প্রয়োজনে সেসব সমালোচনার জবাবও দিতে হয়েছিল কখনও-কখনও। কিন্তু রবিদাকে কোনও দিনও উৎপলদার নামে কোনও আক্রমণাত্মক উক্তি করতে শুনিনি। উনি আমাকে একটা কথা বলেছিলেন—'প্রত্যেকের জন্য ময়দান খালি আছে, যে নিজের রুচি অনুযায়ী সৃষ্টি করতে পারবে, সেই ময়দানে দৌড়তে পারবে।'

সে-অর্থে জুটি বেঁধে আমাদের প্রথম ছবি ছিল 'সাধু যুধিষ্ঠিরের কড়চা'। মনে আছে, এই ছবিটার জন্য মুম্বই থেকে জয়া (বচ্চন)-কেও নিয়ে আসা হয়েছিল। ছবিটা খুব জনপ্রিয় হয় এবং প্রচুর প্রশংসাও কুড়িয়েছিল। এমনকী মানিকদাও ছবিটার খুব প্রশংসা করেছিলেন। পরবর্তী কালে মানিকদার সান্নিধ্য যেটুকু লাভ করেছি, বা ওঁর যে-ক'টা ছবিতে আমি অভিনয় করার সুযোগ পেয়েছি—রবিদা না থাকলে সেটা কোনও দিন সম্ভব হত না। সত্যজিৎ রায়ের 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবিতে আমি যে একটি ছোট চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পেয়েছি, সেই খবরটাও রবিদা আমাকে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—'যা, হয়ে গেল তোর...!'

ওঁর জীবনের অন্যতম অনুপ্রেরণা ছিলেন ওঁর স্ত্রী অনুভা গুপ্ত। অনুভা দেবী যখন একজন প্রতিষ্ঠিত অভিনেত্রী, তখন রবিদা এক স্ট্রাগলিং অভিনেতা। অথচ কী অদ্ভুতভাবে তাঁদের মধ্যে


'জন অরণ্য'-র শুটিংয়ে সত্যজিৎ রায় নির্দেশ দিচ্ছেন।

একটা সুন্দর সম্পর্ক গড়ে ওঠে! রবিদার সান্নিধ্যে এসে অনুভা দেবী চলচ্চিত্রে অভিনয় ছেড়ে চলে আসেন মঞ্চে। প্রথম রবিদাকে ভেঙে পড়তে দেখি অনুভা দেবীর মৃত্যুর পর। প্রায় দেড় বছর উনি নাটক-চলচ্চিত্র থেকে বিরত ছিলেন। এই সময়টা যাঁরা ওঁর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা হলেন—উমানাথ ভট্টাচার্য, ভোলা দত্ত, নিমাই ঘোষ, সৌমেন্দু রায় প্রমুখ। এছাড়াও রবিদার কিছু অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু—রবি বন্দ্যোপাধ্যায়, ডায়া মুখোপাধ্যায়। ওঁর মতো প্রতিভাও হয়তো শেষ হয়ে যেত, যদি সেই সময় এই কয়েকজন পাশে না-থাকতেন। দেড় বছর পর তিনি যখন পর্দায় ফিরে আসেন, তাঁর যাত্রা শুরু হয় 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এর মাধ্যমে।

রবিদার মতো পারফেক্‌শনিস্ট আমি জীবনে খুব কম দেখেছি। কাজের প্রতি ওঁর একটা অদ্ভুত প্যাশন ছিল। উনি কিছুটা থিওরি মেনে অভিনয় করতেন ঠিকই, কিন্তু ওঁর মতো নিখুঁত অভিনয়-ক্ষমতা খুব কমজনেরই ছিল। সিনেমার জগতে এসে ওঁর কাছ থেকে কত কিছু যে শিখেছি, তা বলে শেষ করা যায় না। অভিনয়ের পাশাপাশি শিখেছি ছবির নানারকম টেকনিক্যাল দিক। একটা বিষয়, যেটা আমাকে ভীষণভাবে মুগ্ধ করত, তা হল ওঁর 'পজ' (pause) নেওয়ার টাইমিং। অর্থাৎ দু'টো সংলাপের মধ্যে কতটা থামা উচিত, আবার কখন সংলাপ বলতে হবে—এই ব্যাপারটা দারুণ বুঝতেন। যাঁরা 'অরণ্যের দিনরাত্রি' দেখেছেন, তাঁরা লক্ষ করবেন, বহু সিনেই 'pause'-এর কী চমৎকার প্রয়োগ আছে। আমি ওঁকে দিনের-পর-দিন অবজার্ভ করে এটা রপ্ত করেছিলাম।

আমি অভিনয়ের ক্ষেত্রে বহুবার 'এক্সটেম্পোর'-এর প্রয়োগ ঘটিয়েছি। সহজ ভাষায় বলতে গেলে, যাকে বলে 'তাৎক্ষণিক সংলাপ' বানিয়ে বলার পদ্ধতি। রবিদা চিরকাল এই পদ্ধতির বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে, পরিচালক যা করতে বা বলতে বলবেন, উনি তা-ই বলবেন। প্রচুর প্রশ্ন করতেন উনি যে কোনও দৃশ্যে অভিনয়ের আগে। দৃশ্যটি না-বুঝে, পরিচালক কী চান সেটা না-জেনে, উনি কোনও দিন 'টেক' দিতেন না।

এই সূত্রে একটা মজার ঘটনার কথা বলি। আমরা একসঙ্গে একটা ছবি করেছিলাম। পরিচালক ছিলেন এক চিত্রগ্রাহক (নাম করছি না)। খুব বড় বাজেটের ছবি ছিল। যিনি পরিচালক ছিলেন, তিনি চিত্রগ্রাহক হিসেবে যত দক্ষ ছিলেন, পরিচালক হিসেবে ঠিক তার বিপরীত।

প্রথম দিন শুটিং ছিল এয়ারপোর্টে। তখন শুধুমাত্র এয়ারপোর্টের লাউঞ্জ-টাই ভাড়া পাওয়া যেত আট হাজার টাকা প্রতি ঘণ্টার হিসেবে। আমরা সকাল দশটার মধ্যে শুটিং-স্থলে পৌঁছে যাই। অথচ আমরা দু'জনে কোন রোলে অভিনয় করছি, তা জানতাম না। এদিকে পরিচালক তখন খুব ব্যস্ত। কারণ, মুম্বই থেকে এক সুন্দরী অভিনেত্রীকে আনা হয়েছে। তাঁর পোশাক, মেক-আপ নিয়েই পরিচালকের নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড়। হঠাৎ রবিদা পরিচালক মহাশয়কে ডেকে জিগ্যেস করলেন—'আমার আর চিনু-র সিচ্যুয়েশন-টা একটু বুঝিয়ে দিন না, তৈরি করে রাখি।' পরিচালক উত্তরে হেসে খুন, শুধু বলছেন—'দারুণ, দারুণ—ভাবা যায় না!' এর পর যতবারই আমরা জিগ্যেস করি, তিনি হাসতে থাকেন। শেষে রবিদা খানিকটা রেগে গিয়ে বলেন—'আমাদের ডায়লগগুলো কী?' অবশেষে পরিচালক স্ক্রিপ্ট বের করে আমাদের দেখান। স্ক্রিপ্টে লেখা—'রবি ঘোষদা...' এবং 'চিনুদা...'। 'কম্পোজিট শট অফ রবিদা এবং চিনুদা...।' রবিদা শুধু আমাকে ডেকে বলেছিলেন—'সিরিয়াস হবি না... ধর আমরা পিকনিক করতে এসেছি।'

একদিকে সংলাপ নেই, অন্যদিকে কীসের রোল তা-ও জানি না। অবশেষে পরিচালক জানালেন যে, আমরা দু'জন ডিটেকটিভ। গল্পটা ছিল এরকম—ধনী বাড়ির ছেলে একটি মেয়ের সঙ্গে মুম্বইয়ে পালাচ্ছে। আমাদের খোঁজ দিতে হবে গিন্নিমাকে যে, তাঁর ছেলে কার সঙ্গে, কেন পালাচ্ছে।

যেমনতেমন করে শুটিং করে টাকা নিয়ে আমরা প্রচুর ফুর্তি করেছিলাম। রবিদা প্রচুর বন্ধুকে ডেকেছিলেন। উনি বলতেন, 'এটা তো রোজগার নয়, লোক ঠকানো—এ পয়সা আমি রাখব না।' ছবিটার বাকি অংশটা পরিচালক বদলে, তাঁর ওপর দিয়েই অন্য আর একজনকে এনে, ছবিটা শেষ করা হয়। সেই অংশটায় আমরা সিরিয়াসলি কাজ করেছিলাম এবং ছবিটা প্রচুর ব্যবসা করেছিল, খুব জনপ্রিয় হয়েছিল।

আর একটা টেকনিক ছবিতে ব্যবহৃত হয়, যাকে বলে 'ডাবল টেক'—অর্থাৎ একই সংলাপ দু'ভাবে বলা। রবিদা বলতেন যে, তিনি এই টেকনিক উৎপলদার কাছ থেকে শিখেছিলেন। আর আমি শিখেছিলাম ওঁর কাছ থেকে। অভিনয়ের ক্ষেত্রে, ওঁর সময়জ্ঞান ছিল চোখে পড়ার মতো। রবিদা চ্যাপলিনের ভক্ত ছিলেন। অভিনয় প্রসঙ্গে বলতে গেলে আমি বলব, উনি যখন অভিনয় করতেন, ওঁর পায়ের নখ থেকে মাথার চুল—সব কিছুতেই থাকত অভিব্যক্তি। বিশেষ করে চোখ দু'টো ছিল ওঁর সম্পদ। শুধুমাত্র চোখের অভিব্যক্তির মাধ্যমে, কোনও সংলাপ না-বলেও যে সব কিছু দর্শকদের বুঝিয়ে দেওয়া যায়, সেটা তাঁর অভিনয় দেখেই শিখেছিলাম। আমি যে-বিষয়টায় ভীষণভাবে ওঁকে অনুকরণ করতাম তা হল, ওঁর বডি ল্যাঙ্গোয়েজ। রবিদার এই দক্ষতা আমাকে আজও অভিভূত করে।

ব্যক্তি হিসেবে উনি ছিলেন অতি সরল-সহজ, ডিসিপ্লিনড। সময়জ্ঞান ছিল চোখে পড়ার মতো। এমন একটা দিনের কথাও আমার মনে পড়ে না, যেদিন উনি দেরি করে স্টুডিওতে এসেছেন। যে-চরিত্রটায় অভিনয় করতেন, সেটাকে ভালভাবে স্টাডি করে, একপ্রকার চরিত্রগুলোয় 'প্রাণ' দিতেন। শৃঙ্খলাবোধ ও সংযম-শক্তি যে একজন অভিনেতার জীবনে কত জরুরি, সে-সবই শিখেছিলাম রবিদার কাছে।

এক সময় কালীঘাটের মহিম হালদার স্ট্রিটে আমরা দু'জন একই ঘরে ভাড়া থাকতাম। অর্থাৎ রুম-মেট। সেই সুবাদেই ওঁর সঙ্গে অনেকটা সময় কাটানোর সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। অত্যন্ত রঙিন মানুষ ছিলেন। একঘেয়েমি ধারে-কাছে আসতে পারত না। শুটিংয়ের পর মাঝে-মাঝেই ব্যাডমিন্টন খেলতাম, ওঁর শরীরচর্চার বিষয়ে খুব আগ্রহ ছিল। একসঙ্গে রেস্তোরাঁয় খেতে যেতাম। 'হোটেল হিন্দুস্তান' ও 'গ্রেট ইস্টার্ন'-এ ছিল আমাদের নিত্য যাতায়াত। তখন আসানসোল থেকে আমার বন্ধুবান্ধবরা এলে সবাই 'গ্রেট ইস্টার্ন'-এই উঠত। তাই ওখানে আড্ডার আসর বসলে খাওয়াদাওয়াটাও ওদের ওপর দিয়েই হয়ে যেত। এই পথটাও রবিদাই আমাকে শিখিয়েছিলেন—কোথায় খরচ করা উচিত আর কোথায় নয়।

রবিদা খুব একটা খাদ্যরসিক ছিলেন না, তবে ইলিশ মাছের প্রতি ওঁর একটা দুর্বলতা ছিল। এছাড়া 'অ্যালেন' আর সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ-এর 'মিত্র কাফে'-র কাটলেট খেতে উনি খুব পছন্দ করতেন। রেস্তোরাঁতে নানান মজার অভিজ্ঞতা হত আমাদের। তখনকার দিনে যেখানেই যেতাম বহু অনুরাগী আমাদের টেবিলের দিকে ছুটে আসতেন। কেউ-কেউ আবার ওঁদের সঙ্গে এক টেবিলে বসার অনুরোধ করতেন। রবিদাকে দেখতাম কীরকম দক্ষতার সঙ্গে তাঁদের এড়িয়ে যেতে। অথচ কোনও ঔদ্ধত্য থাকত না সেই প্রত্যাখ্যানের মধ্যে। সেকালের বহু স্বনামধন্য ব্যক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপ ছিল রবিদার। সেই সূত্রে আমার সঙ্গেও উনি অনেকের আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। ডা. বারীন রায়, সাহিত্যিক সমরেশ বসুর মতো স্বনামধন্য মানুষের সঙ্গে আমার আলাপ রবিদার সূত্রেই।

রবিদা সম্পর্কে অনেকেরই যে-বিষয়টা অজানা, তা হল সাহিত্যচর্চায় ওঁর অপার আগ্রহ। স্বদেশি-বিদেশি দু'রকম সাহিত্যই তিনি চর্চা করতেন। রবিঠাকুরের লেখা তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। আমাকে একবার উনি 'বিসর্জন' কবিতাটি পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। সে এক অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতা। না-শুনলে বলে বোঝানো যায় না! বিদেশি সাহিত্যে শেক্সপিয়র ওঁকে বহুবার পড়তে দেখেছি। উৎপলদার সঙ্গে শেক্সপিয়র-এর নাটকে তিনি অভিনয়ও করেছিলেন। 'মিডসামার নাইটস ড্রিম' নিয়ে একটা ছবি করার ওঁর খুব ইচ্ছে ছিল, যদিও তা হয়ে ওঠেনি আর।

'সাধু যুধিষ্ঠিরের কড়চা', 'চারমূর্তি'-র পর আমরা ফের জুটি বাঁধি অরুন্ধতী দেবীর পরিচালনায় 'পদি পিসির বর্মী বাক্স'-তে। আউটডোর শুটিং ছিল। তখনকার দিনে আমি, রবিদা, জহরদা একসঙ্গে কোথাও 'আউটডোর' করা মানেই প্রচুর ভিড়। আগে তো মানুষ ক্যামেরা দেখলেই ভিড় করত। আর সেই ভিড় সামলে অভিনয় করতে জান কয়লা হয়ে যেত। তো, সেবার আমরা বোলপুরের কাছে প্রান্তিক স্টেশনে শুটিং করতে যাই। জায়গাটা ছিল খুব সুন্দর—চতুর্দিকে তালগাছ, ধানখেত আর ধু-ধু মাঠ। শুটিংয়ের এরকম মনোরম স্পট দেখে সবাই খুব উৎসাহিত : যাক, কেউ বিরক্ত করবে না! রবিদা তো ফুর্তির চোটে বেসুরো গলায় রবি ঠাকুরের গানও শুরু করেছে—'পাগলা হাওয়ায় বাদল দিনে...'। কিন্তু কী করে জানি, গ্রামে-গ্রামে রটে গেল আমাদের আসার বার্তা। ব্যস, মিনিট চল্লিশের মধ্যে প্রায় তিন হাজার লোক শুটিংস্থলে উপস্থিত!

একজন বয়স্ক মহিলা এসে আমায় জিগ্যেস করলেন—'ও খোকা, ছবিটার নাম কী গো?'

আমি বলি, 'পদিপিসির বর্মী বাক্স'।

—কী পিসি?

একটা কথা প্রায়ই শোনা যায় বহু পরিচালকের মুখে যে—'ভাবছি এবার একটা হাসির ছবি করব।' এত সহজে এবং সারল্যের সঙ্গে কথাগুলো বলেন যে, শুনলে মনে হয় সবচেয়ে সোজা হাসির ছবি করা। অথচ বিলি ওয়াইল্ডার'কে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল যে আপনি ব্যঙ্গাত্মক ছবি করা ছেড়ে একেবারে সিরিয়াসধর্মী ছবি করেন কেন? উত্তরে তিনি ব্যঙ্গাত্মক ছবি সম্পর্কে বলেছিলেন, 'To make such films is more challenging.' কিন্তু বাংলায় হাসির ছবি করার সময় এই ধরনের মনোভাব কারো থাকে না।

('বাংলা ছবিতে হাসি', 'ঋত্বিক স্মারক বক্তৃতা', সিনে ক্লাব অফ ক্যালকাটা, ১৯৮৬)



তিন মূর্তি : (বাঁদিক থেকে) চিন্ময় রায়, অনুপকুমার ও রবি ঘোষ।

—পদিপিসি।

—পরে একটা কী বাক্স বললে?

—হ্যাঁ, পুরো নাম 'পদিপিসির বর্মী বাক্স'।

—এত লম্বা নাম রাখো কেন? মনে থাকে না। সিনেমাটা তো আমরাই দেখব!

তারপর এক অল্পবয়সি মেয়ে এসে বলে,

—এই যে, আপনি তো 'হাটে বাজারে' করেছিলেন?

—হ্যাঁ।

—এই ছবিটার নামটা বলবেন?

—'পদিপিসির বর্মী বাক্স' ভাই।

—ও আচ্ছা, 'পদিপিসির বর্মী বাক্স ভাই'?

—না না, ভাই-টা বাদ দিন।

—আর একবার বলবেন?

—'পদিপিসির বর্মী বাক্স'।

আমি ভাবছিলাম, এরকম বুঝি শুধু আমার একার সঙ্গেই হচ্ছে। পরে দেখি জহরদা, রবিদাও একে-ওকে সিনেমার নাম বুঝিয়ে চলেছেন। কিছুক্ষণ পর রবিদা আমাদের দু'জনকে ডেকে জিগ্যেস করলেন—'ডিভিশন অফ লেবার' বুঝিস? আমরা বললাম, 'হ্যাঁ।' তারপর ঠিক হল, আমি ছবির নাম জিগ্যেস করলে বলব 'পদি', রবিদা বলবেন 'পিসি', আর জহরদা বলবেন, 'বর্মী বাক্স'। এরকম প্রায় আধঘণ্টা চলল।

এরপর শটের জন্য ডাক পড়ল। রবিদার শট ছিল। রবিদা ক্যামেরার সামনে এলেন। 'অ্যাকশন' বলার পর তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর আরও একবার শট নিতে বললেন। এবার 'অ্যাকশন' বলা মাত্রই তিনি বলে উঠলেন, 'পদি'। আমি দূর থেকে বলে উঠলাম 'পিসি', জহরদা বলে উঠলেন 'বর্মী বাক্স'। তারপর সব ঘটনা অরুন্ধতী দেবীকে বলে সেদিনের মতো প্যাক আপ হল। এবং রাতে লজ-এ ফিরে ঘুমের ঘোরেও রবিদা ও জহরদা—'পদি' আর 'বর্মী বাক্স' বলতে লাগলেন!

'ধন্যি মেয়ে', 'সুবর্ণগোলক', তপন সিন্‌হা পরিচালিত 'আপনজন'-এও আমরা একসঙ্গে অভিনয় করেছিলাম। ষাটের দশকের শেষ থেকে আশির দশকের শুরুর সময়টাকে তখন বলা হত 'গোল্ডেন পিরিয়ড'। এই সময়কালে মুক্তি পাওয়া প্রায় অর্ধেক ছবিতেই আমরা কাজ করেছিলাম। তবে আমার মতে, আমাদের একসঙ্গে সেরা অভিনীত ছবি 'সাধু যুধিষ্ঠিরের কড়চা'। পরবর্তী কালে রবিদার পরিচালনায় সমরেশ বসু-র লেখা 'বিবর'-এও আমি মঞ্চে অভিনয় করেছিলাম। সেই সময় বুঝতে পারি যে, তিনি শুধু একজন দক্ষ অভিনেতা নন, নাট্য পরিচালক হিসেবেও অতুলনীয়। রবিদার সঙ্গে একসঙ্গে থাকার সূত্রে দেখেছিলাম, ক্লাসিকাল গানের প্রতি তাঁর অপার আগ্রহ। রবিদার সঙ্গে থেকে এত কিছু শিখেছিলাম, জেনেছিলাম যে, একটা সময়ে আমাদের মধ্যে একটা আত্মীয়তা গড়ে ওঠে, তার ফলে ওঁর কথাই আমার বেদবাক্য বলে মনে হত। ওঁর পরিবারের সঙ্গেও আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আলাপ ছিল। ওঁর বাড়িতেও যাতায়াত ছিল। ভোলা দত্ত, নিমাই ঘোষ, উমানাথ ভট্টাচার্য আমরা সবাই একসঙ্গে সময় কাটাতাম।

একজন সহশিল্পীর চোখ দিয়ে দেখতে গেলে বলব যে, ওঁর মতো সহশিল্পীকে সাহায্য খুব কম অভিনেতা করতেন। পাশাপাশি অভিনয় করতে গেলে যে-সহায়তার প্রয়োজন হয় একজন প্রবীণ অভিনেতার কাছ থেকে—তিনি তা সব সময় করতেন। অনেক অভিনেতাকেই দেখেছি, যাঁরা চান না সহ-অভিনেতা তাঁর থেকে বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠুক। কিন্তু রবিদার সঙ্গে কাজ করে বুঝেছি, সত্যিকারের বড় মাপের অভিনেতা কাকে বলে! সহশিল্পীকে নিজের সঙ্গে টেনে নিয়ে যাওয়া, ব্যক্তিস্বার্থ ত্যাগ করে একটা ছবি যাতে ভাল হয় সেই চেষ্টাই উনি সব সময় করতেন।

ওঁর অভিনয় চিরকাল আমাকে মুগ্ধ করেছে, তবে রবিদা অভিনীত 'অরণ্যের দিনরাত্রি' আমার দেখা তাঁর সেরা ছবি। এছাড়াও 'হাঁসুলিবাঁকের উপকথা', 'অভিযান' আমাকে আজও মুগ্ধ করে। একজন এত বড় মাপের অভিনেতার সঙ্গে কাজ করতে পেরেছি বলে গর্ব হয়।

অনুলিখন : তিতাস

প্রচ্ছদ কাহিনির ছবি ও পুনর্মুদ্রিত লেখাগুলো রবি ঘোষ স্মৃতি সংসদ প্রকাশিত 'রবি ঘোষ' স্মারক সংকলন থেকে সংসদের সভাপতি ও আহ্বায়ক ডা. বারীন রায়ের অনুমতিক্রমে গৃহীত।

স্বপ্নময় চক্রবর্তী

হলদে গোলাপ



আটচল্লিশ

সমকামিতা কি জিনগত? যমজ ভাইদের দু'জনেই কি সমকামী হয়? অনিকেতের মাথার মধ্যে নানা প্রশ্ন কিলবিল করে। বাড়িতে মন্টুকে নিয়ে সমস্যা বাড়ছে। শুক্লা ওকে বাড়িতে রাখতে চায় না, আবার ছাড়তেও চায় না। শেষে প্রস্তাব দেয়, বিকাশ ঠাকুরপোর হেফাজতে দিলে হয় না!

জানা গেল, ওসামা বিন লাদেন নামে কেউ একজন আছে, যে আমেরিকায় ওই সন্ত্রাসের পিছনে আছে। লোকটা রহস্যময়। আরবে বিরাট ব্যবসা ছিল। তারপর নানা দেশে ঘুরছে। কিন্তু লোকটাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না।

টেলিভিশনে দেখাচ্ছে 'গ্রাউন্ড জিরো'। জায়গাটার ভগ্নস্তূপ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। বিক্ষত জায়গাটার স্মৃতি-স্তূপ পড়ে আছে, দুলালীর উপড়ে ফেলা গুপ্তস্থান যেন। ওখানে কান্না জমছে। ফুলও জমছে।

আর একটা 'গ্রাউন্ড জিরো'-তে গেল অনিকেত। বিকাশের বাড়ি। ফোন করেছিল আগেই। জড়ানো গলায় বিকাশ বলেছিল, ডোন্ট ডিস্টার্ব মি।

অনিকেত বলেছিল, অফিস যাচ্ছিস না কেন?

বিকাশ বলেছিল, কী হবে গিয়ে?

অনিকেত বলেছিল, এখন ন্যাকামি করিস না।

কিছুক্ষণ বেল টেপার পর বিকাশ দরজা খুলল। ঘর-ভর্তি সিগারেটের টুকরো। কয়েকটা মদের বোতল মানসিক প্রতিবন্ধীদের মতো শুয়ে আছে, বসে আছে। টেবিলে পুকাইয়ের একটা হাস্যমুখর ছবি, মালা দেওয়া, মালার ফুল শুকিয়ে গিয়েছে। ডাইনিং টেবিলে কয়েকটা পাঁউরুটির খোলস পড়ে আছে। পড়ে আছে পৃথিবীর অবক্ষয়ী সহনশীলতা।

—কি বে? রগড় দেখতে এলি?

বিকাশ ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল।

—আর নাটক করিস না বিকাশ। খুব হয়েছে। এবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আয়।

অনিকেত ওর বিছানায় বসে বলে।

—'স্বাভাবিক জীবন' আবার কী? আমার জীবন কী করে 'স্বাভাবিক' হবে ফের? বউ চলে গিয়েছে। আমার গায়ে থুথু দিয়েছে। সত্যিকারের থুথু। ওর থুথু আমি হাত নিয়ে চেটে মাথায় মেখেছি। শ্বশুরবাড়ি থেকে কেউ আমার খোঁজ নেয়নি।

—আমি তো খোঁজ নিতে এসেছি!

—মানে, কতটা মদ খাচ্ছি জানতে? নাকি বাড়িতে আবার অন্য মেয়েছেলে ঢুকিয়েছি কি না বুঝতে?

—শোন বিকাশ, আবার বলছি নাটক করিস না। তুই আমার আত্মীয়, তুই আমার বন্ধু। অনিকেত একটু হাসে। পরিবেশটা হালকা করার চেষ্টা করে। বলে—'সিরাজদৌল্লা' নাটকে ছিল না? সিরাজদৌল্লা বলছে বিপদের দিনে যে-ই না কাছে এসে দাঁড়ায়, সে-ই না আত্মীয়, সে-ই না প্রকৃত বন্ধু...

বিকাশ চুপ করে থাকে।

—অফিস যাস না কেন?

—গিয়ে কী বলব? সবাই তো জিগ্যেস করবে। অফিসের কয়েকজন বাড়িতে এসেছিল। সবাই গল্প শুনতে চায়। কেন ঝাঁপ দিল? এর আগের রাতে কী করেছিল? সকালবেলায় কী খেয়েছিল? তারপর কী বলেছিল...

—বলবি, একবার বলবি। তারপর আর বলবি না।

—কী বলব? ওকে বকাবকি করেছিলাম সেটা বলে দেব? মেরেছিলাম, প্রায়ই মারতাম, সেটাও বলে দেব? ওকে আমি সৌরভ বানাতে চেয়েছিলাম, ও সৌরভ হতে পারবে না ভেবে মরে গেল—মানে 'মেরে দিলাম'—বলে দেব? তা হলে সব বলে দিতে হয়, এভরিথিং। আমি যে আসলে বাঁজা, আমার স্পার্ম হয়টয় না—বাঁজা দোষটা মেয়েদেরই জোটে। আমি শালা বাঁজা। যখন আমাদের বাচ্চা হচ্ছিল না, তখন টেস্ট করিয়েছিলাম তো। প্রথমে পারমিতার। বারবার। ডাক্তাররা বলল, ওর সব 'ওকে'। তারপর আমার। তখন দেখা গেল স্পার্ম কাউন্ট কম। তোদের বলিনি...

—বলেছিলি, হিন্ট দিয়েছিলি তুই। আমি বুঝে গিয়েছিলাম। তাতে কী? এরকম অনেকেরই তো হয়।

—ওই জন্যই তো—ওই জন্যই তো আমি সন্তানের মর্ম বুঝিনি। নিজের ঔরসের সন্তান তো প্রায় আমি-ই, সে তো আমারই অংশ। আমি কি আমাকে মারতে পারতাম? আমাকে নিয়ে তোদের আর ভাবতে হবে না। আমাকে আমি চিনে গিয়েছি। তোরা শালা সোহম। 'সে-ই আমি'। সেই ঈশ্বরের অংশ তোরা। আমিও জেনে গিয়েছি 'কো হম'—কে আমি। শয়তানের অংশ। আমি বস্তুত বাজে লোক। স্পার্ম নেই অথচ সেক্স আছে। পুকাই'কে অ্যাডপ্ট করেছিলাম, সেটা সবাই তো জানে। ওকে দিয়ে আমি 'খেল' দেখাতে চেয়েছিলাম। খেল। মিরাকেল দেখাতে চেয়েছিলাম।

অনিকেত বলল, এভাবে ভাবিস না বিকাশ। তুই একটা পুরো মানুষ। তোর পঞ্চ ইন্দ্রিয় ষড় রিপু—না কী বলে যেন—তার সব কিছুই আছে। যৌনতা যেমন আছে, বাৎসল্যও আছে। পুকাই'কে ওর ছোটবেলায় বেলুন ধরিয়ে দিসনি—ওর একটু হাসি দেখবি বলে? ওকে কোলে নিয়ে চিড়িয়াখানার বাঁদরের খাঁচার সামনে যাসনি? ওকে ঘুম পাড়াসনি পাশে শুয়ে? গল্প বলিসনি?

—হ্যাঁ, নিউটনের গল্প বলেছি, সেই আপেল পড়ার গল্প, যেন নিউটনের থেকে এনথ্যু পায়। ডন ব্র্যাডম্যানের গল্প বলেছি। পক্ষীরাজ-টক্ষিরাজ বলিনি।

—যা হয়ে গিয়েছে, হয়ে গিয়েছে। তোর মধ্যে ঠিকই ভালবাসা আছে। একটা অনাথ আশ্রম দেখে এসেছি রানাঘাটে। একটা লোক রাস্তার বাচ্চা ধরে এনে বাড়িতে রেখেছে। ওদের কিছু সাহায্য করবি?

—ওরা 'জেনুইন' তো? ঝেড়ে দেবে না তো?

—আমি তো দেখে এসেছি। জেনুইন। সেন্ট পার্সেন্ট।

—তুই বললে দেব কিছু।

—কেন দিবি?

—তুই বললি বলে।

—না। তোর মধ্যেও ভালবাসা আছে বলে! তোর রোজগারের টাকায় আরও কারও ভাল হোক—মনে-মনে চাস বলে। তোদের অফিসে যখন রক্তদান শিবির হয়, তুই ওখানে রক্ত দিস'। আমি জানি। কেন দিস?

—ক্রেডিট নেব বলে।

—না কি ভালবাসা তোর ভিতরে আছে বলে? বিকাশ চুপ করে থাকে। কী খেলি আজ? অনিকেত জিগ্যেস করে।

—মদ ফুরিয়ে গিয়েছে। আনতে যেতে ইচ্ছে করছে না।

—এখন বেলা তিনটে মতো বাজে। কিছু খেয়ে নে। আমি নিয়ে আসছি। অনিকেত বলে।

বিকাশের চোখে জল ছিল। জেনুইন। কোনও ব্যাটাছেলে সাধারণত অন্য ব্যাটাছেলের চোখে জল মুছিয়ে দেয়•

দুর্গাপুজো হয়ে গিয়েছে। প্যান্ডেল খোলার কাজ চলছে। এ বছর আলোর খেলায় সন্ত্রাস দেখানো হয়েছিল। আলো সাজিয়ে তৈরি এক জোড়া বাড়ি... একটা এরোপ্লেন ধাক্কা দিল, আর বাড়িটার চারদিকে লাল-লাল কুচো বাল্‌ব জ্বলতে লাগল—নিভতে লাগল...। মানুষ বলছিল, দারুণ! একটা থিমের পুজোর খুব নাম হয়েছিল এবার। খুব ভিড়। 'গ্রাউন্ড জিরো'-তে দুর্গাপুজো। পোড়া গাছ থেকে হাত-পা ঝুলছে। চাপ-চাপ রক্ত। দুর্গার কাপড়টা কিছুটা পুড়ে গিয়েছে। অসুরের মুখ লাদেনের মতো। এখন প্যান্ডেল থেকে টেনে-হিঁচড়ে খুলে ফেলা হচ্ছে সন্ত্রাস। এরই মধ্যে দু'টো ঠান্ডা তন্দুরি রুটি আর এক ভাঁড় গরম তড়কা নিল। বলতে ভুলল না 'পিঁয়াজ কাঁচালঙ্কা' দিন। পলিথিন ঝুলিয়ে বিকাশের বাড়ি যাওয়ার পথে এদিন গান এল ওর মনে—'ভীরু ভীরু চোখে তুমি চলে গেলে'..., ওখানেই আছে 'এই যে যাওয়া আসা সেই তো ভালবাসা'... ওই লাইনটা সামান্য পাল্টে দিল অনিকেত 'এই যে নিয়ে আসা সেই তো ভালবাসা'... টারারে টারাটারা টাররা... 'বেসেছি ভাল যারে ব্যথা সে দিতে পারে' টারেরা টারেরা টারটারা...।

চোখের কোণায় তোর নোংরা। চোখ পরিষ্কার কর বিকাশ। দাঁত মেজে নে। স্নান কর। আমি তোকে খাইয়ে যাব। যখন এসব বলছিল অনিকেত, দেখছিল দেওয়ালে আটকে আছে পারমিতার চোখ। না, চোখ নয়, টিপ। কিছুটা খয়েরি। তাকিয়ে আছে। অপলক।

বিকাশের মাথায় হাত দিল অনিকেত। হাতটা ঘাড় পর্যন্ত টেনে আনল। আর তখন মুখে দু'হাত চাপা দিয়ে কেঁদে উঠল বিকাশ, আর কী আশ্চর্য, দেওয়াল থেকে টিপ-টা খসে গেল।

বিকাশ কাঁদছে। ভালবাসা পেল বলে? কাঁদালে তুমি মোরে ভালবাসার ঘা-এ?

—এবার একটু চা খেয়ে নে।

রান্নাঘরে গেল অনিকেত।

একদম কিছু যে খাওয়াদাওয়া করেনি বিকাশ, এমন নয়। কিচেনে গিয়ে ডিমের ভাঙা-খোলা দেখল অনিকেত।

বিকাশের চোখে জল ছিল। জেনুইন। কোনও ব্যাটাছেলে সাধারণত অন্য ব্যাটাছেলের চোখের জল মুছিয়ে দেয় না। ওটা

মেয়েদের। হোমো'দেরও। অনিকেত ম্যাজিশিয়ানের কায়দায় হাওয়ায় হাত নাড়িয়ে চোখের জল মোছানোর মুকাভিনয় করে বলে, কাঁদিস না। বি স্টেডি। বিকাশ ফোঁপায়। যতটা স্বতঃস্ফূর্ত, তার চেয়ে কিছুটা বেশি। এ সময়ে কোনও পুরুষ নারী-কণ্ঠে শুনতে চায়, 'এরকম করে না সোনা...'

কথাটা পাড়ার এটাই শুভযোগ—অনিকেত ভাবল।

বলল—যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে বিকাশ, নতুন করে আবার জীবন শুরু কর। আমি একটা ছেলেকে বাড়িতে রেখেছিলাম, জানিস নিশ্চয়। শুক্লা-ই ওকে রেখেছিল। স্কুলে ভর্তি করিয়েছিল। নরম টাইপের ছেলে, ওবিডিয়েন্ট। তোর কাছে থাক ও। রান্নাবান্নাও টুকটাক জানে, তবে ওকে দিয়ে রান্না করাতে হবে না, রান্নার লোক রেখে দে। ওই ছেলেটা তোর কাছে থেকে পড়াশোনা করুক, ওর কেউ নেই। ওকে নিয়ে নে। পরে ওকে কিছু একটা রোজগারপাতির ব্যবস্থা করে দিস। এমনও হতে পারে, ওকে ড্রাইভিং-টা শিখিয়ে দিলি, তুই যদি গাড়ি কিনিস, ও চালাবে। ড্রাইভার কাম সেক্রেটারি। আগেকার দিনে বড়-বড় বাড়িতে নায়েব থাকত। বাজারহাট থেকে গার্জিয়ানগিরি সব করত। এখন নায়েবের বদলে ড্রাইভার। অনেক বাড়িতে ড্রাইভারই ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর। পারমিতার সঙ্গে মান-অভিমান শেষ হয়ে গেলে, ও তো চলে আসবে, ওরও খুব উপকারে আসবে। একটা সারপ্রাইজ হবে বেশ।

—তোরা ছাড়ছিস কেন ওকে? বিকাশের গলার স্বরে একটু করে প্রত্যয় জেগে উঠছে যেন...।

—শুক্লাকে আমার ওখানে নিয়ে যাব ভাবছিলাম তো...! দুলালের মা বলে যে-মহিলাটি কাজ করত আমাদের বাড়ি, ওর নাতি ও। বাবা-মা নেই। বুড়ি বলে গিয়েছিল নাতিটাকে দেখতে। শুক্লা তাই রেখেছিল ওকে। ওর জন্য শুক্লা আটকে গিয়েছে। তোর যদি উপকার হয়, তোকে দিতে পারি।

—চুরিটুরি করে পালাবে না তো? বিকাশের গলার স্বর ক্রমশ সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠছে।

—না না... খুব অনেস্ট। এ ব্যাপারে গ্যারান্টি।

কাপড়ের ফেরিওলার মতো কথাটা নিজের কানেই লাগল অনিকেতের। 'একদম পাকা রং মশাই, গ্যান্টি'...।

—বলছিস? একটা ছেলেটেলে হলে তো ভালই হয়... ঠিক আছে, একবার পারমিতার সঙ্গে একটু... ধুর। অভ্যেসটা গেল না। আগে সব কিছুর আগেই বলতাম তো 'পারমিতার সঙ্গে একটু কথা বলেনি!' অভ্যেসটা রয়ে গিয়েছে। আমার বাবা খাওয়ার পরে কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচাত। সব দাঁত ফেলে দেওয়ার পরও খাওয়ার পর একটা কাঠি নিয়ে মুখের ভিতরে ঢোকাত। দিয়ে যাস ছেলেটাকে। ওকে একদম ছেলের মতো দেখব না। ছেলেটেলের মতো ভাবব। কোনও সেন্টিমেন্ট নয়। বয়স কত?

—চোদ্দো-টোদ্দোর মতো। অনিকেত মাথা চুলকে বলে।

—বাজে বয়স। আমার পুকাই...। হ্যাঁ, একটা কথা। ও কিন্তু পুকাইয়ের সাবস্টিটিয়ুট নয়। নেভার।

—ঠিকই তো! ও কেন পুকাইয়ের সাবস্টিটিয়ুট হতে যাবে? থাকবে বাড়িতে। খাবে, লেখাপড়া করবে, দরকার হলে চা-টা করে দেবে, খাবারদাবার আনবে... এই তো...।

—ঠিক আছে। দিয়ে যাস...।

একটু আনন্দ-আনন্দ ভাব হল অনিকেতের। একটা অচল টাকা চালিয়ে দেওয়ার আনন্দ হল ওর মনে।

অটোয় উঠল। অটোয় স্টার্ট দেওয়ার শব্দে যেন শুনতে পেল আদম ব্যাপারী।

'আদম ব্যাপারী' কথাটা শুনেছিল এক বাংলাদেশির মুখে। যারা মানুষ পাচার করে ওদের 'আদম ব্যাপারী' বলে। ওই ব্যবসায়ীরা লোক পাঠায় মধ্য প্রাচ্যে, মালয়েশিয়ায়, সিঙ্গাপুরে...। শ্রমিকের কাজে পাঠায়। অটোর ঘরঘর শব্দে শোনে, দাস ব্যবসা এখনও আছে। দাদা, দাস ব্যবসা এখনও আছে... দাদা... দাস ব্যবসা... বার্লিন শহরের ওপর একটা ভিডিও দেখেছিল ইন্টারনেট-এ। মনে পড়ল। আলেকজান্ডার ট্রাসে এলাকার একটা রাস্তা। পুরনো বাড়িগুলোয় বুলেটের ক্ষত। হিটলারের আমলে সমকামীদের ওখানে জড়ো করে গুলি করা হয়েছিল। তখন কে নর্ডিক, কে ইহুদি বিচার করা হয়নি। জানা গিয়েছে সমকামী, ব্যস। গুলি করে মারো। ১৯৪৩ সালের বুলেটের শব্দ এখন অটোর ইঞ্জিন থেকে বের হচ্ছে কেন? লরির কালো ধোঁয়া ওকে কি দুয়ো দিচ্ছে?

কেন এমন মনে হচ্ছে? ছেলেটাকে তো পাচার করছে না, বেচেও দিচ্ছে না নিলাম বাজারে। একটা মার্কেটের সামনে নেমে গেল অটো থেকে। মন্টুর জন্য একটা শার্ট কিনল বেশ ভাল দেখে।

পরি বলেছিল, ওর মা ওকে নিয়ে রাস্তায় বেরয় না। পরি বলেছিল, ওর মামার বাড়িতে কার যেন বিয়ে ছিল। না-গেলেই নয়। মঞ্জু একা গিয়েছিল, পরি পরি-র মতো। অনিকেত কি মন্টুকে নিয়ে খুব একটা বেরয়? বাজার-টাজার ছাড়া? বাজারে নিয়ে যায় ব্যাগটা বইবার জন্যই তো। মানুষ কেমন করে যেন তাকায়। মানুষের চাউনিকে বড় ভয়। কোনও-কোনও চাউনি আছে—নারকোল কোরানির মতো। ছেঁচে দেয়। কোনও-কোনও চাউনি—গুলতির মতো। টাঁই করে লাগে। কোনও-কোনও চাউনি—পিন ফোটানোর মতো।

অনিকেতের মনে পড়ে, একদিন ওর অফিসের কর্তাদের কনভিন্স করিয়ে নিষিদ্ধ আর গোপন ব্যাপারগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিল, 'ট্যাবু' বিষয়গুলোর তালা খুলে দিয়েছিল, গুমরে-মরা প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। বেতারে। বলেছিল, সমকাম কোনও বিকৃতি নয়। সমকামীদের সমাজের মূল স্রোতে রাখার জন্য সওয়াল করেছিল। এখন, একটা ওই-ধরনের-ছেলেকে নিজের সংসার থেকে সরিয়ে দিচ্ছে! হিপোক্রিট। কথায়-কাজে মিল নেই।

বার্ডেন। বার্ডেন। হোমো-টোমো নয়, কোনওরকম ঝামেলাই আমি চাইনি আসলে। আমি তো আমার স্ত্রী'র চাপে পড়ে ওকে ঘরে ঢুকিয়েছিলাম... যেন কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে উত্তর দিচ্ছে অনিকেত। ওর জন্য মাস্টারও রাখা হয়েছিল পড়ানোর জন্য। আমি একটা সরকারি চাকরি করি, কতই-বা মাইনেপত্র পাই! ওর জন্য তো চেষ্টা করেছিলাম...

—কী চেষ্টা!

—পড়াশোনার... খাওয়াদাওয়া আমাদেরই মতো। বরং ও ঘরে ছিল বলেই মাছটাছ আনা হত। কচুরি-সিঙাড়া-রোল। নইলে শুক্লা খুব সিম্প্‌ল লাইফ 'লিড' করে। এই তো দেখুন না ধর্মাবতার, জামার প্যাকেট। ব্র্যান্ডেড। মন্টুর জন্যই তো কিনলাম। বাড়ি যাওয়ার সময় বোঁদে নিয়ে যাব মন্টু ভালবাসে বলে।

মন্টুর পক্ষের উকিল বলল—ওসব তো কাঁঠালপাতা মশাই। যে-পাঁঠাকে বলি দেওয়া হয়, ওর জন্য কাঁঠালপাতা এনে রাখা হয় দ্যাখেননি? কী বলবেন অনিকেতবাবু?

—তা কেন? তা কেন? ওকে তো অন্য একটা জায়গায় ব্যবস্থা করছি। ভাল থাকবে-খাবে। ও যদি ওর বাড়িতে থাকত, ওর জ্ঞাতিরা হয়তো প্রাণেই মেরে ফেলত ওকে। বলতে গেলে উদ্ধার করে বাড়িতে রেখেছিলাম। লেখাপড়ার জন্য মাস্টারও...

—লেখাপড়ায় কেমন ছিল মন্টু?

—ভাল না, একদম ভাল না। রেজাল্ট ভাল করত না একদম। আমি নিজেও ওকে পড়াতে গিয়েছি। কিস্যু মাথায় ঢোকে না।

—ছবিটবি আঁকতে পারে?

—না, সেসব গুণও নেই।

—গান গাইতে পারে?

—না, তাও না। যদি ওসব পারত, যদি জানতাম ট্যালেন্ট আছে, রেখে দিতাম ঘরে। আদর করে রেখে দিতাম। 'হোমো'

'আদম ব্যাপারী' কথাটা শুনেছিল এক বাংলাদেশির মুখে। যারা মানুষ পাচার করে ওদের 'আদম ব্যাপারী' বলে

তো কী হয়েছে? পৃথিবীতে কত গায়ক, চিত্রশিল্পী, চলচ্চিত্র পরিচালকরা 'গে'। ও তো কোনওটাই না।

—বেশ। একস্ট্রা-ট্যালেন্টেড হলে ওকে ঘরে রাখতেন। মানে মূল স্রোতে রাখতেন। তেমন ট্যালেন্টেড নয় যারা—ওদের কী হবে? দূরছাই করে বিদেয় করবেন! যদি ও আপনার নিজের ছেলে হত? নিজের ঔরসজাত, এবং ওর বয়ঃসন্ধিতে বুঝতেন ও 'গে', তা হলে কি করতেন?

—এ নিয়ে কোনও প্রশ্ন হয়? সিম্পল উত্তর—ওকে মানুষ করতাম।

—যদি ওর ঘরে ছেলেবন্ধু ঢুকত, এবং বুঝতেন ছেলেটির সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত, কী করতেন?

—আমি কিছু মনে করতাম না, তবে শুক্লা...

—সব কিছু শুক্লার ঘাড়ে চাপাবেন না। সব দোষ শুক্লার—আর, আপনি তুলসী পাতা! মনে করুন মন্টু আপনার ছেলে, এবং সে মিডিওকার। এবং 'গে'। কী করতেন আপনি?

—আমি? আমি কাউন্সিলিং করাতাম...

—ন্যাকা? একমাত্র পরিবেশগত কারণ হলে কাউন্সিলিং-এ কাজ হয়। হোস্টেলে, জেলখানায়, মিলিটারি ব্যারাকে যেসব সমকামী সম্পর্ক তৈরি হয়, এবং পরে অভ্যেস হয়, কিংবা বয়ঃসন্ধিতে একটু-আধটু—যা নিছক কৌতূহলবশত, কাউন্সিলিং-এ তাতে হয়তো কাজ হয়। আপনি সবই জানেন অনিকেতবাবু। এখানে ওসব নিয়ে বক্তৃতা মারার জায়গা নেই।

—তবুও কাউন্সিলিং-ই করতাম। পিতা হিসেবে ওটা আমার কর্তব্য ছিল। সেটা করাতাম।

—তো, মন্টুর ক্ষেত্রে সেটা করাচ্ছেন না কেন?

—হয়তো লাভ হত না...

—দু'রকম কথা হয়ে যাচ্ছে অনিকেতবাবু। লাভ হবে কি হবে না সে তো পরের কথা। প্রথমে তো আপনি প্রাথমিক চেষ্টাটা করতেন, না কি?

—অত ঝামেলা পারব না। প্রথমে কাউন্সিলিং, তারপর ওষুধ, তারপরে শক থেরাপি, তারপরে ব্লু ফিল্ম দেখানো... তাতেও কাজ হবে কি না ঠিক নেই, আমি পারব না... আমি হাত উঠিয়ে দিলাম ধর্মাবতার। আমি ছাপোষা মধ্যবিত্ত। ব্র্যান্ডেড শার্ট কিনি না, ফুটপাথে বাজার করি, বড় রেস্তোরাঁয় ঢুকি না সাধারণত... আমি অত পারব না। যা করেছি অনেক করেছি, আমায় যা শাস্তি দেওয়ার দিন।

এজন্য তো কোনও শাস্তির নির্দেশ নেই বাবুসোনা... ধর্মাবতার হাসেন।

অনিকেত মুক্তি পায়। ওর হাঁটাটা নিজের কাছেই একটু অন্যরকম লাগছে। প্রেমার্থ কবির কবিতাটা মনে পড়ল। 'চাঁদেতে কম 'G' তাই চাঁদে লাফাচ্ছি'—এরকম কিছু। হালকা লাগছে।

'এখানে অর্শ-ভগন্দর দাদ-হাজা নারী-পুরুষের গোপন রোগ সারানো হয়।' 'মদ ছাড়ানো হয়' একটা সাইন বোর্ড দেখল অনিকেত। সমকামিতা সারানো হয় এরকম বিজ্ঞাপনও দেখেছিল কোথাও। ওয়েবসাইটে বোধহয়। লং ডিস্ট্যান্স ট্রিটমেন্ট। একজন 'যোগগুরু' বলেছিলেন প্রাণায়ামে সমকামিতা সারে। পিরের দরগায় কিংবা মন্দিরের সামনের গাছে যেসব ঢিল ঝোলে, মনোবাসনার—সেখানে কি সমকামিতা-মুক্তির ঢিলও ঝোলে? মঞ্জু কি পরির জন্য ঝুলিয়েছিল ওরকম কোনও ঢিল?

সত্যিই যদি অনিকেতের ছেলেই হত মন্টু, বা মন্টুর মতো কেউ? শুক্লা কি খুন্তির ছ্যাকা দিত? না না, শুক্লা ওরকম করত না হয়তো!

একটি ছেলেকে দেখেছিল, ওর হাতের চামড়া কুঁচকে গিয়েছে। রবীন্দ্র সদনে ওদের আড্ডায় হাত নেড়ে কিছু নিষেধ করছিল। হাতের চামড়া ছিল কুঁচকানো। কেন জিগ্যেস করেনি অনিকেত। জিগ্যেস করা যায় না। শুধু খুন্তি ছ্যাকায় হয় না ওরকম।

এখনও তো মৃগী রোগের ওষুধ দেওয়া হয়—একদল ডাক্তার বিশ্বাস করেন সমকামিতা এক ধরনের নিউরো এপিলেপ্টিক দশা। কন্ডিশনড রিফ্লেক্স-ও ঘটানো হয়। নগ্ন পুরুষ-শরীর

দেখানো হয়, ছবিতে কিংবা ভিডিওতে। এবং ওটা দেখলেই ইলেকট্রিক শক; পুরুষ শরীরের দিকে তাকালেই শক খেতে হবে এরকম একটা রিফ্লেক্স তৈরির চেষ্টা এখনও তো চলে।

কে জানে অনিকেত কী করত?

মঞ্জুকে নাকি এক কাউন্সিলর বলেছিলেন—পর্নোগ্রাফি-র বই পড়তে দিন—মেয়েদের ছবিটবি দেখুক, পারলে ব্লু।

—মা হয়ে কী করে আমি এসব করব?

—সেটা আপনি বুদ্ধি বার করুন।

অন্য এক সাইকোলজিস্ট বলেছিলেন—গান-বাজনা শুনতে দেবেন না একদম। আর্ট-ফার্টের ব্যাপারটা থেকে দূরে রাখবেন। ওগুলো হল ফেমিনিশ। ওই নন্দন, অ্যাকাডেমি, রবীন্দ্র সদন চত্বরে যত কম যায় ততই ভাল।

ও যেখানে থাকে, সেখানকার একজন মহিলা বলেছিল—তোমার ছেলেকে আমি সাতদিনে ঠিক করে দিতে পারি। আমার এক বোনঝি আছে। ব্যাটাছেলে চরিয়ে খায়। একটু টাকাপয়সা নেবে, কিন্তু এমন করে দেবে যে, মেয়েছেলের জন্য পাগল হয়ে যাবে। ছলছাতুরি জানা মেয়ে চাই। তোমার ছেলের চেয়ে আমার ভাইঝি বয়সে বড়। তাতে কী, এক হপ্তা ওর সঙ্গে মেশামিশি করতে দাও, ঘর ছেড়ে দাও, গ্যারান্টি দিচ্ছি ঠিক হয়ে যাবে। মঞ্জু এসব বলেছিল অনিকেতকে।

অনিকেত জ্ঞান দিয়েছিল, বলেছিল, এসবে কিচ্ছু হয় না।

সেই কথাটাই আবার নিজেকে বলল।

সত্যিই বোঁদে কিনল। বাড়ি এসেই মন্টুর হাতে বাক্সটা দিল অনিকেত। বলল, বোঁদে। তুই ভালবাসিস...।

মন্টু লাজুক হাসল। বাঁ হাত দিয়ে আবার হাসিটাকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করল।

বিকাশ ঠাকুরপোকে কেমন দেখলে? শুক্লা জিগ্যেস করল।

—ওর সঙ্গে সত্যিই কারও থাকা দরকার। একা থাকলে মরে যাবে। কথা বলে এসেছি। মন্টুকে রেখে দেব ওখানে।

শুক্লা দাঁতে ঠোঁট চাপল একটু। ওটা অনেকটা 'যেতে নাহি দিব'-র বডি ল্যাংগুয়েজ। তারপর ঠোঁট থেকে দাঁতটা ছেড়ে দিয়ে ঠোঁটটা উলটে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। এটা হল—'তবু যেতে দিতে হয়'।

শুক্লা বলল, কবে পাঠানোর কথা ভাবছ?

—এবারে পাঠিয়ে দিলেই হয়... অনিকেত বলল।

শুক্লা আবার ঠোঁট কামড়াল।

—ওর স্কুল কী হবে, স্কুল?

—এখানে কি স্কুল নেই? কোথাও ভর্তি হয়ে যাবে...

—ভাঙা-মাসে স্কুলে ভর্তি নেবে নাকি কেউ?

—তার মানে সামনের বছর? অনিকেত বলে।

শুক্লা বলে—তা হলে আরও ক'মাস। থাকুক...। ও তো চেঞ্জও হতে পারে, তাই না? ওকে কোনও সাইকোলজিস্টের কাছে নিয়ে গেলে হয় না?

ব্যাপারটা আবার রিওয়াইন্ড হয়ে গেল।

শুক্লা বলল, একটু ভাল থাকতে চেয়েছিলাম আমি। ভাল থাকার এত ঝামেলা? আমি ভেবেছিলাম, একা-একা ভাল থাকা যায় না, ভাল থাকা অনেকের সঙ্গে ভাগ করে নিতে হয়। নিজের ভাল থাকাটা কিছুটা অন্যকে দিতে হয়। অন্যের ভাল লাগার কিছুটা নিতে হয়। ওই জন্যই তো কল্পনাদির সঙ্গে কাজ করছি। তুমি কুণাল লামা-র কথা বলেছিলে না! কী সুন্দর করে বেঁচে আছে। আমি তো এজন্যই মন্টুকে এনেছিলাম। ও ভাল করে বাঁচবে, ওকে ভাল করে মানুষ করব...। কিন্তু...

—কিন্তু কী!

—কিন্তু ও তো ভাল থাকার নয়...। ভাল থাকছে না। পরপর কয়েকটা ঘটনায়...। অনিকেত মহা সমস্যায় পড়ল। বলে ফেলেছিল প্রায়—ওর বয়ঃসন্ধির এই আচরণ, ওর যৌনতা-সম্পর্কিত ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ওপর তোমার ভাল থাকা না-থাকা নির্ভর করছে কেন?

বলল না। বাঁশ কেন ঝাড়ে... না না, কী দরকার বাবা—খাচ্ছে তাঁতি তাঁত বুনে কাল হলে এঁড়ে কিনে...।

অনিকেত বলল, মন্টুর এই স্বভাব পালটাবে না। আমি দেখেছি কয়েকটা কেস। পালটায় না।

শুক্লা বলল, কল্পনাদি-র সঙ্গে এসব নিয়ে কথা বলব ভেবেছিলাম... কিন্তু নিজেদের ঘরের কথা... বলিনি... যদিও কল্পনাদি খুব ভাল, হেল্পফুল। বললে নিশ্চয়ই কোনও সাইকোলজিস্ট-এর সন্ধান দিতে পারবেন।

—সে তো তুমিও খোঁজ করতে পারো...।

অনিকেত বলল, খোঁজ করে দেখতেই পারি, কিন্তু মিছিমিছি সময় যাবে। আমার এত সময় কোথায়? তুমি নিয়ে যাবে? একদিন গেলে আবার হয় না... অনেকগুলো 'সিটিং' দিতে হয়।

শুক্লা বলল, ওর সঙ্গে বাইরে বেরতেই আমার লজ্জা করে। কেমন করে যেন হাঁটে! কেমন করে যেন তাকায়...।

—তাতে কী হয়েছে? হাঁটাচলা নিয়ে এত ভাবার কী আছে? ওর যদি একটা পায়ে ডিফেক্ট থাকত? ওর সঙ্গে হাঁটতে না?

মহৎ থাকাটাও একটা লোভ। সবাই কেমন অন্যের কাছে মহৎ থাকতে চায়। নিজের স্ত্রী-পুত্রের কাছেও। এমনকী নিজের কাছেও। অনিকেত যে মন্টুকে বিদেয় করতে ততটা আগ্রহী নয়, সেটা শুক্লার কাছে দেখাতে চায়। অনিকেত শুক্লার মনটা বুঝে ফেলার পর বলে—তোমার কল্পনা মৈত্রকে বলে দ্যাখো না, উনিই নিয়ে যাবেন। উনি নিশ্চয়ই আগ্রহী হবেন...।

শুক্লা বলল—এইমাত্র তুমি যে বললে—কাউন্সিলিং করে কিছু হয় না...। আমারও তো মনে হয়, এটা জন্মগত।

অদ্ভুত একটা লুডো খেলা চলছে। কেউ সাপের মুখে পড়তে চাইছে না। একবার জোরে শ্বাস নেওয়ার সময় অনিকেতের মনে হল 'ই'-তে ইচ্ছে। শুক্লা বোর্ডে লিখে রেখেছে। একটা ইচ্ছে তৈরি হচ্ছে না তো...।

অনিকেত শুক্লার দিকেই বলটা ঠেলে দিল। বলল, তুমি যা ভাল বোঝো...। তবে এটা ঠিক, ইচ্ছে করলেই তুমি তো বলতে পারতে কাল থেকে এই বাড়িতে তোর স্থান নেই। তা তো বলছ না। একটা অল্টারনেটিভ ব্যবস্থা করে দিচ্ছ...।

শুক্লা আবার ঠোঁট কামড়ায়।

অনিকেত বলে, পারমিতার সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলতে চাও?

শুক্লা বলে, পারমিতা কিচ্ছু বলবে না। বিকাশকে নিয়ে ওর কোনওরকম ইনভলভ্‌মেন্ট নেই ও বলেছে। ফোনে কথা হয়েছে কয়েকবার। শুধু এ কারণে নয়, পুকাইয়ের মৃত্যুর জন্যই নয়, বিকাশকে নানা কারণে হেট করে ও। আমাকে বলেছে।

অনিকেতও কিছু-কিছু জানে। বিকাশ মহিলার সঙ্গ করে। কোনও মহিলার সঙ্গে শুতে পারাকে ও পৌরুষের প্রকাশ মনে করে। ওর স্পার্মহীনতা-জনিত হীনম্মন্যতা থেকেই হয়তো ওটা করে। বিকাশ সব কিছু খুলে বলেনি, তবে বিকাশকে একাধিকবার বলতে শুনেছে, কোনও মহিলাকে শোয়ানো আমার কাছে জলভাত। ভেরি ইজি টাস্ক।

হ্যাঁ, 'টাস্ক' শব্দটা বলে।

স্কুলের ফার্স্ট বয় উৎপলের মতোই। অনুশীলনীর শেষের কঠিন অঙ্কগুলোকে ও বলত 'ইজি টাস্ক'।

শুক্লার ঠোঁট কামড়ানো শেষ হয়ে গিয়েছে কিছুক্ষণ আগে।

শুক্লা এবার বলল, আমি না, তুমিই বলো। তুমি যা বলবে...

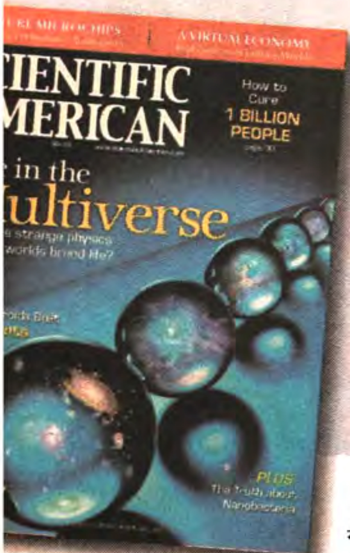
অনিকেত বলল, না, তুমিই বলো।

যেন 'সপ্তপদী' সিনেমার উত্তম-সুচিত্রার মোটরসাইকেল ট্রিপ। 'না না তুমিই বলো'। মুখে হাসি, চোখে ছল, প্রেমে ভরা মন।

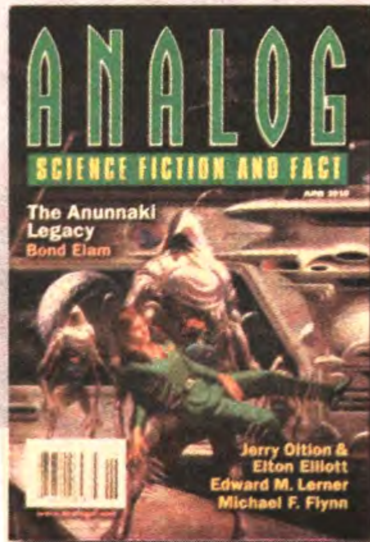
(ক্রমশ)

অলংকরণ : শান্তনু দে

বহুরূপী কল্পবিজ্ঞান



‘কল্পবিজ্ঞান কাকে বলে?’ এই প্রশ্নের উত্তরে ক্যাম্পবেল একবার বলেছিলেন, ‘কল্পবিজ্ঞান পত্রিকার সম্পাদকরা যা ছাপেন, তা-ই কল্পবিজ্ঞান।’



কল্পবিজ্ঞানের রূপের শেষ নেই। আর শেষ নেই বলেই নিখুঁত কোনও সংজ্ঞা দিয়ে একে এখনও বাঁধা যায়নি। কল্পবিজ্ঞান লেখকরা এবং সম্পাদকরা নানা সময়ে এর নানারকম সংজ্ঞা পেশ করেছেন, কিন্তু তাতেও দেখা গিয়েছে কল্পবিজ্ঞান যেন পুরোপুরি ধরা দেয়নি। সে কেবলই পালিয়ে বেড়ায়।

সংজ্ঞার কথায় আসার আগে বলা যাক ডেনিস ফ্ল্যানাগ্যান-এর কথা।

ফ্ল্যানাগ্যান সুদীর্ঘ সাঁইত্রিশ বছর বিখ্যাত পত্রিকা ‘সায়েন্টিফিক আমেরিকান’-এর সম্পাদক ছিলেন। যদিও পত্রিকাটির জন্ম ১৮৪৫ সালে, ১৯৪৮-এ পত্রিকাটিকে নতুনভাবে সাজগোজ করিয়ে আধুনিক চেহারায় প্রকাশ করা হয়। এই কাজে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জেরার্ড পিয়েল, এবং তাঁর সঙ্গী ছিলেন ডোনাল্ড এইচ মিলার আর ডেনিস ফ্ল্যানাগ্যান। সম্পাদক হিসেবে ফ্ল্যানাগ্যান তখন থেকেই দায়িত্ব নেন। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হল, ফ্ল্যানাগ্যান কলা বিভাগের (ইংলিশ মেজর) ছাত্র ছিলেন—বিজ্ঞানের বিষয়ে তাঁর প্রথাগত কোনও জ্ঞানই ছিল না। তবে ‘সায়েন্টিফিক আমেরিকান’-এর দায়িত্ব নেওয়ার আগে তিনি ‘লাইফ’ পত্রিকার বিজ্ঞান বিভাগের সম্পাদক ছিলেন।

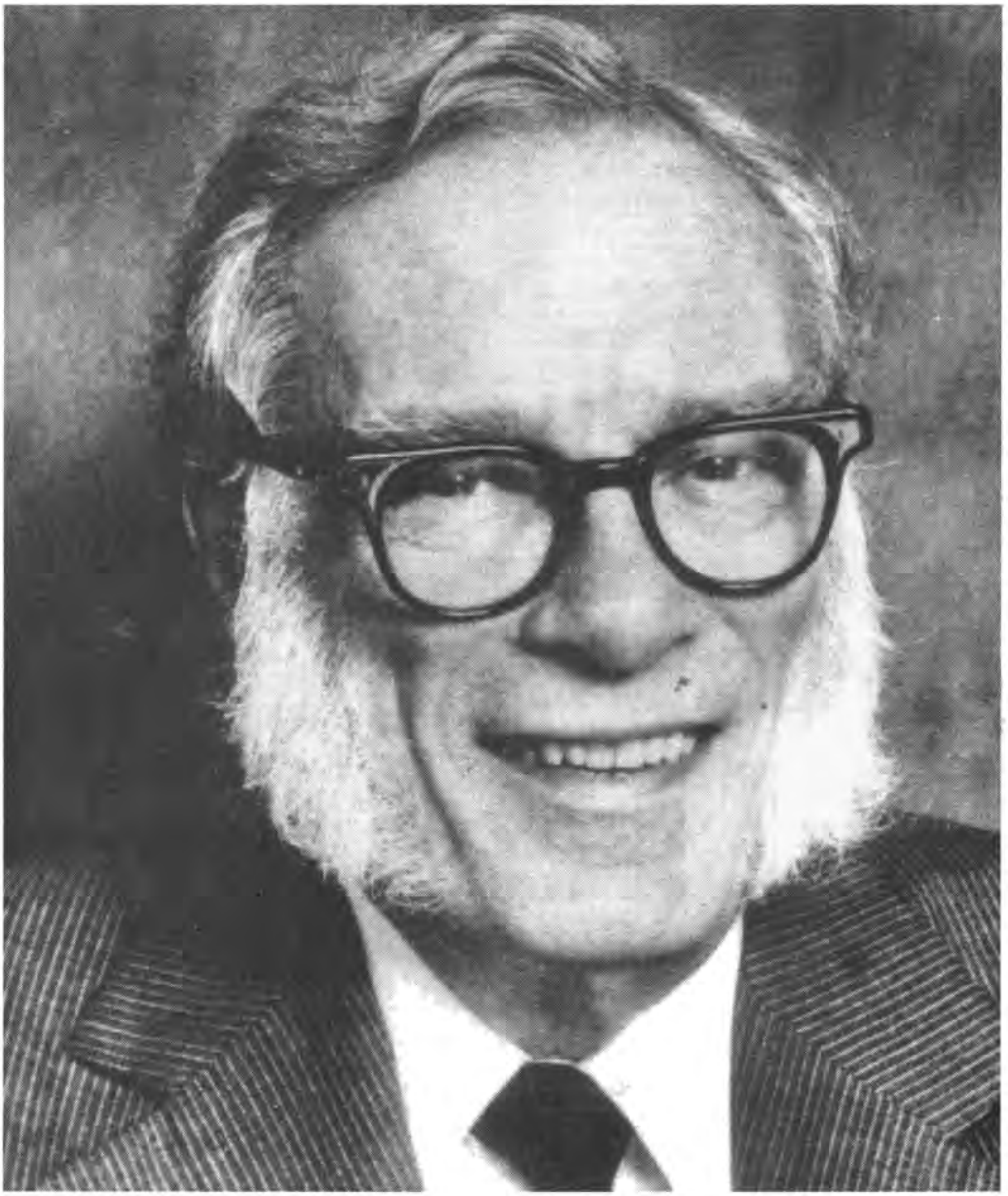
‘বিজ্ঞান কাকে বলে?’ এই প্রশ্ন ফ্ল্যানাগ্যানকে সবসময়ই ভাবিয়েছে। প্রায় সকলেই এই প্রশ্নের উত্তর জানেন নিজের মতন করে। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার হল, একজনের সঙ্গে আর একজনের উত্তর পুরোপুরি মেলে না। এ যেন ঠিক ‘অন্ধের হস্তীদর্শন’-এর দশা—হয়তো বা তার বেশ কয়েক গুণ।

একবার একজন ডাচ সাংবাদিক ফ্ল্যানাগ্যানের সাক্ষাৎকার নেন। ডাচ ভাষার খবরের কাগজে সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয়। কাগজের কপি পেয়ে একটি বাক্যে ফ্ল্যানাগ্যানের চোখ আটকে যায় ‘Wetenschap is wat wetenschappers doen.’

সাক্ষাৎকারে বিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ফ্ল্যানাগ্যান বলেছিলেন, ‘বিজ্ঞানীরা যা করেন সেটাই বিজ্ঞান।’ ডাচ বাক্যটি এই ‘সংজ্ঞা’রই অনুবাদ। বাক্যটির প্রেমে পড়ে গিয়ে ফ্ল্যানাগ্যান সেটিকে বড় করে ছাপিয়ে নিজের অফিসের বুলেটিন বোর্ডে পিন দিয়ে গেঁথে রাখেন।

ডেনিস ফ্ল্যানাগ্যানকে নিয়ে এই গৌরচন্দ্রিকার কারণ নিশ্চয়ই এতক্ষণে বোঝা গিয়েছে!

ফ্ল্যানাগ্যানকে অনুসরণ করে সহজ কথায় কল্পবিজ্ঞানের সংজ্ঞাকে ধরতে চাইলে আমরা বোধ হয় বলতে পারি, ‘কল্পবিজ্ঞান লেখকরা যা লেখেন, সেটাই কল্পবিজ্ঞান।’



আইজ্যাক অ্যাসিমভ

পৃথিবীর সমস্ত সায়েন্স ফিকশন পত্রিকার সর্বকালের সেরা সম্পাদক ছিলেন জন উড ক্যাম্পবেল। ১৯৩৭ সালে মাত্র সাতাশ বছর বয়সে তিনি 'অ্যাস্টা-উন্ডিং স্টোরিজ' পত্রিকার সম্পাদক হন। তখনই পত্রিকাটির নাম বদলে করা হয় 'অ্যাস্টাউন্ডিং'। পত্রিকাটি পরে আরও দু'বার নাম বদল করে প্রথমে 'অ্যাস্টাউন্ডিং সায়েন্স ফিকশন', এবং পরে নাম বদলে হয় 'অ্যানালগ'। তবে সম্পাদক বদল হয়নি। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত আমৃত্যু ক্যাম্পবেল পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন। বিদেশের সায়েন্স ফিকশনকে আধুনিক এবং সাবালক করে তোলার কাজে ক্যাম্পবেলের ভূমিকা ছিল অনন্য।

'কল্পবিজ্ঞান কাকে বলে?' এই প্রশ্নের উত্তরে ক্যাম্পবেল একবার বলেছিলেন, 'কল্পবিজ্ঞান পত্রিকার সম্পাদকরা যা ছাপেন, তা-ই কল্পবিজ্ঞান।'

সন্দেহ নেই, ওপরের দু'টি সংজ্ঞার মধ্যে খানিকটা ঠাট্টা এবং মজার সুর রয়েছে। তবে নিখুঁত সংজ্ঞা অধরা থেকে যাওয়াটাই বোধ হয় এর কারণ।

এবারে তা হলে কয়েকটা পণ্ডিতি সংজ্ঞার কথা বলা যাক।

কল্পবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক আলোচনা নিয়ে যেসব বই প্রকাশিত হয়েছে তাতে সংজ্ঞা হিসেবে সাধারণত এইরকম বলা হয়েছে: 'কল্পবিজ্ঞান কাহিনির প্রধান ভিত হবে আগামীদিনের বিজ্ঞান, আগামীদিনের সমাজ। বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বহির্পাতনের সাহায্যে আগামীদিনের বিজ্ঞান কল্পনা করা যেতে পারে।'

এই সংজ্ঞায় 'বহির্পাতন' শব্দটির অর্থ হল বর্তমান ঘটনার তথ্য হাতে নিয়ে তার সাহায্যে ভবিষ্যতের ঘটনা আন্দাজ করা। অর্থাৎ, বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গতিপ্রকৃতি জেনে তাদের আগামী দিনের অগ্রগতি আন্দাজ করা। যেমন, নিউক্লিয়ার ফিশন আবিষ্কার হওয়ার সময়ই বিজ্ঞানীরা জেনে গিয়েছিলেন,

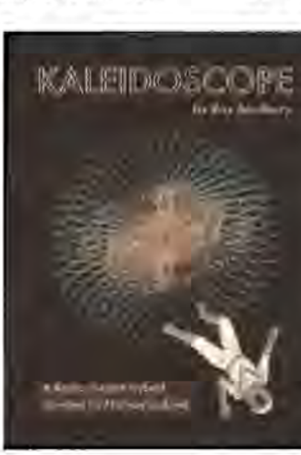
পরমাণু বোমা আর বেশি দূরে নেই। কল্পবিজ্ঞান কাহিনির লেখকরাও সেটা ভাল করেই আন্দাজ করতে পেরেছিলেন।

প্রখ্যাত কল্পবিজ্ঞান লেখক ব্রায়ান অ্যালডিস ও ডেভিড উইনগ্রোভ তাঁদের 'ট্রিলিয়ন ইয়ার স্প্রি' বইতে এরকম একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন : 'SF is the search for a definition of the mankind and his status in the universe which will stand in our advanced but confused state of knowledge (science), and is characteristically cast in the Gothic or post-Gothic mode.'[3]

কিংবদন্তি কল্পবিজ্ঞান লেখক আইজ্যাক অ্যাসিমভ বলেছেন—'Science fiction can be defined as that branch of literature which deals with the reaction of human beings to changes in science and technology.'

১৯৮৫ সালে ডেভিড প্রিঙ্গল একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন এইরকম : 'Science fiction is a form of fantastic fiction which exploits the imaginative perspectives of modern science.'

তবে সব সংজ্ঞার শেষ সংজ্ঞাটি জানিয়েছেন টম শিপি। তিনি বলেছেন—'Science fiction is hard to define because it is the literature of change and it changes while you are trying to define it.'



পণ্ডিতি সংজ্ঞার সামান্য এই কয়েকটি নমুনা পড়ে অনেকেরই হয়তো মনে হবে, জন ক্যাম্পবেলের মতটাই বোধ হয় মেনে নেওয়া ভাল। কিংবা ডেনিস ফ্ল্যানাগ্যানের অনুসরণে যদি মেনে নিই 'কল্পবিজ্ঞান লেখকরা যা লেখেন, সেটাই কল্পবিজ্ঞান।' তা হলে বোধ হয় খানিকটা স্বস্তি পাওয়া যায়।

এবারে আসা যাক কল্পবিজ্ঞানের শ্রেণিবিভাগের প্রসঙ্গে। কল্পবিজ্ঞান কাহিনির রকমফেরের শেষ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে মোটামুটিভাবে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় :

১. ভাবীকালের গল্প। এ ধরনের গল্পে লেখক আগামীদিনের কথা বলেন। বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কার, প্রযুক্তির নতুন ব্যবহার কীভাবে সমাজ আর পরিবেশের ওপরে প্রভাব ফেলছে—এসবই হয় গল্পের মূল উপাদান।

২. দার্শনিক গল্প। এই জাতীয় গল্পে লেখক গল্পের বুনুনির মধ্যে কোনও দার্শনিক প্রশ্ন তোলেন, কিংবা কোনও দার্শনিক উপলব্ধির কথা বলেন। লেখকের এই দার্শনিক ভাবনাটা এমনই যে, কল্পবিজ্ঞান কাহিনির কাঠামো ছাড়া সেটি প্রকাশ করাই অসম্ভব।

৩. বিনোদনের গল্প। এ ধরনের গল্প নেহাতই পাঠকের বিনোদনের জন্য লেখা। সমালোচকদের ভাষায় বলা যায় 'এসকেপিস্ট লিটারেচার' কিংবা 'পলায়নি সাহিত্য'। এ জাতীয় গল্পের মূল উপাদান হল প্লট এবং ঘটনার ঘনঘটা।

এই তিনটি শ্রেণিবিভাগ থাকলেও কোনও কল্পবিজ্ঞানই বিশুদ্ধভাবে শুধুমাত্র একটি শ্রেণির হতে পারে না। বরং তাতে দু'টি অথবা তিনটি শ্রেণির মিশেল থাকে। যেমন, ভাবীকালের কোনও গল্প লিখতে গিয়ে কোনও লেখক তার মধ্যে দার্শনিক প্রশ্ন তুলতে পারেন, বলতে পারেন কোনও দার্শনিক উপলব্ধির কথা। আবার বিনোদনমূলক কোনও গল্পে ঢুকে পড়তে পারে আগামীদিনের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা, নতুন কোনও প্রযুক্তির অভিনব ব্যবহারের কথা।

সায়েন্স ফিকশনের নতুন নতুন লেখকরা রোজই নতুন নতুন ধরনের গল্প লিখছেন। ফলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কল্পবিজ্ঞানের সংজ্ঞার যেমন বিবর্তন ঘটবে, তেমনই বদলাবে শ্রেণিবিভাগের ধরনধারণ।

কল্পবিজ্ঞানের সংজ্ঞা এবং শ্রেণিবিভাগ নিয়ে এত নীরস কচকচির পর একটি দার্শনিক গল্পের নমুনা দেওয়া যাক।

সম্প্রতি প্রয়াত ব্রিটিশ লেখক রে ব্র্যাডবেরি-র একটি বিখ্যাত বই 'দ্য ইলাসট্রেটেড ম্যান'। ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত এই বইটির একটি গল্পের নাম 'ক্যালাইডোস্কোপ'। গল্পটি সংক্ষেপে বললেই বোঝা যাবে, কল্পবিজ্ঞানের কাঠামো ছাড়া এই গল্পটি লেখা সম্ভব ছিল না।

'ক্যালাইডোস্কোপ' গল্পের বিষয় মহাকাশ অভিযান। অভিযান সেরে ফেরার সময় একটি মহাকাশযান বিস্ফোরণে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। মহাশূন্যে এই বিস্ফোরণ ঘটার পর মহাকাশচারীরা ভেসে যায় মহাশূন্যে। কিন্তু নিউটনের গতিজাড্যের নীতি মেনে তারা মহাকাশযানের প্রায় সমান গতি নিয়ে ছুটে আসতে থাকে পৃথিবীর দিকে।

এই অভিযানের দলনেতার নাম হলিস। মহাশূন্যে দুরন্ত গতিতে ছুটে যাওয়ার সময় হলিস ভাবতে থাকে ওর জীবনের কথা—যে জীবন একটু পরেই শেষ হয়ে যাবে। কারণ, ওদের ছুটন্ত শরীর পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢোকামাত্রই প্রবল ঘর্ষণের অসহ্য উত্তাপে ওরা সকলেই নিমেষের মধ্যে জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

শেষ যাত্রায় ভাসতে ভাসতে ক্যাপ্টেন হলিস ভাবছিল, ও খুব খিটখিটে আর স্বার্থপর মানুষ। সহকর্মীদের কখনও ছেড়ে কথা বলেনি। কখনও কোনও ভাল কাজ করেছে বলে মনে পড়ে না। সবসময় নিচু মনের পরিচয় দিয়েছে। কখনও কারও কাজে লাগেনি। সবসময় নিজের, শুধু নিজের কথা ভেবেছে।

ভাবতে ভাবতে শেষ পর্যন্ত হলিসের মনে হল, ওর জীবন পুরোপুরি অর্থহীন। জীবনটা ও জীবনের মতো করে কাজে লাগাতে পারেনি।

এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে হলিসের শরীর পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ধাক্কা খেল। মহাশূন্য থেকে বুলেটের বেগে বায়ুমণ্ডলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ঘর্ষণ। অসহ্য উত্তাপ। দপ করে জ্বলে উঠল হলিসের শরীর। জ্বলন্ত উল্কার মতো বাতাস কেটে ছুটে চলল।

ঠিক সেই সময় ইলিনয়ের শহরতলির পথ ধরে একটি বাচ্চা ছেলে মায়ের সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছিল। সে রাতের আকাশে একটি উল্কা দেখতে পেল—যেটা আসলে হলিসের দেহ—আকাশে জ্বলছে, পুড়ছে।

'উল্কা'টি মায়ের চোখে পড়ামাত্রই মা ছেলেকে ঝটিতি বলেন, 'মেক আ উইশ! মেক আ উইশ!'

এখানেই শেষ হয়েছে ব্র্যাডবেরি-র গল্প।

হলিস যখন সিদ্ধান্তে এসেছে যে, ওর জীবন ব্যর্থ, অর্থহীন, ঠিক তখনই ওর অজান্তে ওর জ্বলন্ত মৃতদেহ একটি অচেনা বালকের কাছে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠল।

আকাশে উল্কা দেখে মনস্কামনা পূর্ণ করার প্রার্থনার ব্যাপারটা বিজ্ঞানের নিরিখে নিতান্তই কুসংস্কার। কিন্তু একটি নিষ্পাপ বালকের অগাধ পবিত্র বিশ্বাস এই প্রার্থনাকে এক অলীক মূল্য দেয়।

এখনও মনে আছে, গল্পটি পড়ার পর রাতের আকাশের দিকে তাকিয়ে আমি অনেকক্ষণ চুপচাপ বসেছিলাম।

স্টেয়ারকেস



ছবি : তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

সিঁড়িই আপনাকে বলবে 'ওয়েলকাম'। বিদায় বেলায় বলবে 'কবে আসিবেন'? হরকুটীরের সিঁড়ি মেজাজে-মর্জিতে যেন স্বয়ং গৃহকর্তা।

কোম্পানির কলকাতায় তখন ভাগ্য ফেরাতে আসা ভাগ্যান্বেষীদের ভিড়। দেখতে দেখতেই অনেকের গায়ে উঠেছে চোগা চাপকান আর মাথায় বেনিয়ানি টুপি। পাট্টা পোট্টা আর দাদনি ব্যবসায়ে নাম লিখিয়ে কোম্পানি বাহাদুরের কৃপায় তাঁদের কেউ হয়েছেন দেওয়ান, কেউ মুৎসুদ্দি আবার কোম্পানি নিশেনের গুণ ভজনা করে কারও কারও কপালে জুটে গিয়েছে 'রাজা', 'মহারাজা' উপাধিও। যাই হোক স্বীয় গুণে বিপুল ধন উপার্জনের পর এই দেওয়ান মুনশিদের প্রায় প্রত্যেকেই আসরে নেমেছিলেন নিদেনপক্ষে আড়ে-বহরে লম্বা-চওড়া একটা অট্টালিকা বানাতে। যেখানে বাইনাচের আসর হবে, হুঁকোর মৌতাত জমবে, আর মাঝেমধ্যেই চলবে কোম্পানি কর্তাদের বাড়িতে ডেকেডুকে ভোজ দেওয়ার পালা। তাই অট্টালিকা হতে হবে এমন, যাকে দেখা মাত্রই তাক লেগে যায়! অট্টালিকার গায়ে আভিজাত্যের সেই ছোঁয়া লাগাতে 'সিঁড়ি' আর 'পরী'-ই প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল সেদিন। পূর্ণেন্দু পত্রী বলেছিলেন, 'পুরনো কলকাতার তাবড় তাবড় বাড়ির গায়ে সিঁড়িটা ছিল জড়োয়া গয়নার মতো জড়ানো।' সেগুলোর কোনওটা কাঠের, কোনওটা পাথরের আবার কোনওটার গায়ে বাইজানটাইন মোজেকের কারিকুরির ফ্লোরা-ফনা। তবে শুধু সিঁড়ি বানালেই হবে না। সেই ওঠা-নামার ধাপে ধাপেই লাগিয়ে দিতে হবে আরও কিছু গোল্ডেন টাচ। তাই দেখা গেল কোনও সিঁড়ির বাঁকে বাঁকে বসল ব্রোঞ্জের পরীর মূর্তি, কোথাও দুই সিঁড়ির সংযোগস্থলে বসানো হল অ্যাপেলো বেলভেডিয়ার, কোথাও সিঁড়ি সংলগ্ন দেওয়াল জুড়ে ঝোলানো হল বিলিতি অয়েল পেন্টিং। আবার কেউ কেউ সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এ বসালেন গ্র্যান্ডফাদার ক্লক। এভাবেই সেজে উঠতে লাগল বনেদি বাড়ির সিঁড়িগুলো।

কিন্তু বলতেই হবে যে, এই নিরিখে 'হরকুটীর'-এর সিঁড়ির চেহারাটা অবশ্য আর দশটা বাড়ি থেকে একেবারেই ভিন্ন। পাথুরেঘাটার 'হরকুটীর' বাড়িটি যাঁর নামে তিনি হলেন খাণ্ডারবানী ঘরাণার প্রখ্যাত ধ্রুপদীয়া হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। মা-বাবার দিক থেকে দেওয়ান বা মুৎসুদ্দির মতো বনেদি পরিবারে জন্ম হলেও পূর্বপুরুষদের নয়, তাঁর নামেই এই বাড়ির আত্মপরিচয় গড়ে ওঠে। তিনি একদিকে ছিলেন ধ্রুপদী সংগীতের মায়েস্ত্র অন্যদিকে ফ্রেঞ্চ, লাতিন, গ্রিক ভাষায় পারদর্শী। রামকৃষ্ণদেব তাঁর গান শুনে ভাবে মোহিত হয়ে যেতেন, এমনকী হরপ্রসাদ পিয়ানো শেখাতে যেতেন ফোর্ট উইলিয়ামের সমর কর্তাদের বাড়িতে। সব মিলিয়ে এক বৈচিত্রময় পুরুষ। এই হরকুটীরের সিঁড়িও কিন্তু এই মানুষটির মতোই বৈচিত্রময়। গ্র্যান্ডফাদার ক্লক নয়, ডানা ঝাপটানো পরী নয় কিংবা রেড কার্পেটও নয়—বলতে গেলে ক'টি মাত্র ইংরেজি আর বাংলা বাক্যের সমাহারই হল হরকুটীরের সিঁড়ি-সজ্জার প্রধান সম্বল। কারণ সিঁড়ির ধাপে ধাপে লেখা বাক্যগুলোর গায়ে জড়িয়ে-জাপটে রয়েছে অভ্যর্থনার বিরল উষ্ণতা, আদর-মাখা আহ্বান কিংবা উষ্ণ বিদায় সম্ভাষণ। সেখানে নেই আভিজাত্যের অহংকার দেখানোর এক চিলতে চেষ্টাও। এবার আসা যাক সিঁড়ির গায়ে কী লেখা আছে সেই কথায়। হরকুটীরের কোনও সিঁড়ির ধাপে ইংরেজিতে বড় হাতের অক্ষরে লেখা 'GOOD MORNING', কোনও সিঁড়ির গায়ে কারুকার্যমণ্ডিত ইংরেজি অক্ষরে লেখা 'Wel Come', আবার কোথাও সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতেই চোখে পড়ে বাংলায় লেখা 'আসুন' কিংবা 'ভাল আছেন' শব্দ দু'টি। তবে সবথেকে আশ্চর্য লাগে, যখন সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় চোখে পড়ে বাংলায় লেখা আরেকটি বাক্য—'কবে আসিবেন'। তখন মনে হয় আভিজাত্য, জৌলুশ আর বৈভবের সমস্ত অহংকার বিসর্জন দিয়ে গৃহকর্তার মনের বার্তা নিয়েই যেন দাঁড়িয়ে আছে একফালি সিঁড়ি। আজও দেখে হয়তো কেউ কেউ বলবেন, 'দেখি নাই কভু দেখি নাই'...।